অন্ধকারের নদী

অন্ধকারের নদী

অভিজিৎ সেন

একুশে ॥ কলকাতা

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৫৮, জুলাই ১৯৫১

স্বত্ব : দীপিকা সেন

প্রচ্ছদ : গণেশ পাইন

মুদ্রণ তত্ত্বাবধায়ী : সুবিমল লাহিড়ী

প্রকাশক : একুশে, ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩

মুদ্রণে : প্রিন্টেক, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা ৪

দীপিকা-কে

আশ্বিন মাসের দশটা-এগারোটা বেলায় অশোকের পৃথিবীকে বড়ো সুন্দর মনে হয়। এ সৌন্দর্য মানুষের তৈরি। রাস্তার দুই পাশে দিগন্তবিস্তৃত ধানখেত, এখন রঙ পালটে হালকা সবুজ। যতদূর চোখ যায়, শুধু এই একই দৃশ্য, অথচ চোখে একঘেয়ে লাগে না। কদাচিৎ দু-একটা মানুষ কিংবা গোরু-মোষের দেখা পাওয়া যায়। কারণ, সময়টা এখন ভারি অলস। মাঠের কাজ শেষ। অশোক ভাবে, ইরাবতীকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারলে বেশ হ'ত। কিন্তু ইরাবতী যদি না আসতে চাইত! মাত্র তো মাসদুয়েকের আলাপ।

তিন-চার কিলোমিটার পিছনে পাকারাস্তা পড়ে আছে। তাকে যেতে হবে আরো তিন কিলোমিটার রাস্তা। কাঁচা রাস্তায় ইতিমধ্যেই গোটা তিনেক গ্রাম তারা পেরিয়ে এসেছে। গ্রামের ভেতরের রাস্তা এখনো খারাপ। বিগত বর্ষার ক্ষত এখনো দগদগে। জীপের মতো গাড়িকেও এগোতে যথেষ্ট কসরৎ করতে হয়েছে। গ্রাম ছাড়ালে মাটির রাস্তা এখন বেশ ভালো। অশোক তার গাড়ির ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করে, ধান এবার খুব ভালো হবে, না বিনয়দা? বিনয় বলে, ভালোই মনে হচ্ছে স্যার। তবে এখনি শেষ কথা বলা যায় না। ওই যে নল হয়েছে, দেখেছেন? ও যদি বেড়ে যায়, তাহলে ফলন অনেক কমে যাবে। – নল কী? – খেতের মাঝে দেখুন লক্ষ্য ক'রে। হঠাৎ হঠাৎ একেকটা গাছ লম্বা হয়ে গেছে। ও হল একরকমের রোগ, ওগুলো ছড়াতে পারে। ওই গাছগুলোর ধান হবে না স্যার।

অশোক জেলার সবথেকে অনুন্নত ব্লকটির বি ডি ও।

মধ্যবয়সী বিনয় তার জীপের ড্রাইভার। অশোক তাকে 'বিনয়দা' বলে। সম্বোধনটা সরকারি মহলে একটু বিস্ময়কর বটে! সরকারি অফিসাররা কোনো অধস্তনকে, বিশেষ করে এত ধাপ অধস্তনকে

'দাদা' ডাকে না। অশোক একটু ব্যতিক্রম। সে ব্যতিক্রম হতে ভালোও বাসে। আবার, আরো একটা কারণ আছে এর পেছনে। জীবনে যত জায়গায় সে থেকেছে, এবং যতরকম গোষ্ঠীতে সে মিশেছে, সর্বত্রই একজন অভিভাবক তার দরকার হয়েছে। তা না হলে সে স্বস্তি পায় না। এই পানজোড়া ব্লকে এসেও প্রথম একমাস সে বেশ অস্বস্তিতে ছিল। অভিভাবক করার মতো লোক সে খুঁজে পায়নি। ব্লকটি কৃষক অঞ্চল দিয়ে ঘেরা একটা বর্ধিষ্ণু বাজার—কৃষিজাত সামগ্রীই যার একমাত্র পণ্য। অশোক কলকাতার মানুষ। কাজেই এরকম একটা জায়গা আর তার মানুষ একান্তই অপরিচিত তার কাছে। শেষ পর্যন্ত বিনয়ের মতো একজন শক্তপোক্ত মধ্যবয়স্ক এবং একা-থাকা মানুষের মধ্যেই সে খুঁজে পেয়েছে তার ঈপ্সিত অভিভাবক। মানুষটাকে তার ভালো লেগেছে তার স্পষ্ট কথা বলার ভঙ্গিতে এবং এই অত্যন্ত অভ্যন্তরের ব্লক পানজোড়ার কর্মচারীকুলকে হাড়ে হাড়ে অপছন্দ করার জন্য। বাস্তবিকই এরকম ধূর্ত এবং অসৎ একদল মানুষকে একসঙ্গে অশোক আর কখনো দেখেনি।

অশোক বলে, কাঞ্চনপুরের প্রধানকে আপনি চেনেন, বিনয়দা ?

বিনয় বলে, চিনি স্যার।

—মালটি কেমন ?

—দেখলেই বুঝবেন, স্যার। জিনিস একখানা !

—করে কী ?

—আগে তো জোতদারি, তেজারতি—এইসব করত, এখন প্রধানের 'চাকরি' করে।

আর এর আধঘণ্টা পরে কাঞ্চনপুরের প্রধানকে দেখে অশোক। গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসে বসে অশোক একজন চৌকিদারকে পাঠায় তাকে ডাকতে। সে এলে অশোক বোঝে, বিনয় ঠিকই বলেছে। জিনিস একখানা ! মানুষটা বেশ লম্বা আর রোগা। চোখা নাক,

ভাঙা চোয়াল আর চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ এবং উচ্ছ্বাসহীন, এসব নিয়ে অমরনাথ ভীষণ সংসারী ও স্বার্থপর মানুষের মতো আত্মগত। বি ডি ও-দের পুরোনো খাতির-সম্মান আর নেই। বস্তুত, তারা এখন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির এক্সিকিউটিভ অফিসার। কিন্তু সে একটা ডবলিউ বি সি এস অফিসার তো বটেই। অশোক অমরনাথের চোখে সেই ধরনের নির্লিপ্তভাব দেখে, যা কোনো হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয়ের অতি বৃদ্ধ ডাক্তারের চোখে তার রোগীরা দেখে।

সে এসে আগে চৌকিদারের দিকে তাকায়, অশোকের দিকে নয়। তারপর বলে, হরেন, বাড়িৎ যায়ে চায়ের ব্যবস্থা করবা ক'।

হরেন বেরিয়ে গেলে সে অশোকের দিকে ফেরে এবং নিস্পৃহভাবে বলে, বলেন ?

চা—এই শব্দটার কী অমোঘ ক্ষমতা, অশোক তা আগেও টের পেয়েছে। এখনো পায়। একঘণ্টা জীপ-ভ্রমণেই চা প্রয়োজনকে অনেক বেশি দরকারি করেছে। সে নিজের অজান্তে এখন নরম হবে, যদি না খুব সতর্ক থাকে। চা, যদিও সে জানে—অনেক সময়ই মুখে নেওয়ার উপযুক্ত হয় না, অথবা একটা সিগারেট—যা নিতান্ত ছোটোলোক না হলে কোনো ধূমপায়ী প্রত্যাখ্যান করতে পারে না, মানুষের বিশেষ করে অশোকের মতো মানুষের, বিচারের কঠোরতা হ্রাস করতে পারে কিংবা সিদ্ধান্তকে নরম করতে পারে।

ফলে, 'স্যার' সম্বোধন না করাতে তার ডেপুটি চৈতন্যে যতটুকু বাষ্প জমেছিল, তার পরিমাণ ঈষৎ কমে। অশোক বলে, দেখতে এলাম আপনার অঞ্চলের কাজকর্ম কেমন চলছে। জয়েন করবার পর তো পুরো ব্লক এখনো ঘুরে দেখা হয়নি। তা কেমন চলছে আপনাদের কাজকর্ম ?

—টাকাপয়সা বন্ধ করি দিলেন তো কামকাজ হোবে কেমন করে ? টাকা যা দিছিলেন সে তো কবেই শ্যাষ।

লোকটা ধূর্ত হলেও অশিক্ষিত। বস্তুত, অশোক আজ একটা

উদ্দেশ্য নিয়েই কাঞ্চনপুরে এসেছে। কুয়ো খোঁড়ার জন্য তার আগের বি ডি ও-র আমলে টাকা দেওয়া হয়েছিল সবক'টা গ্রাম পঞ্চায়েতকেই। তার আগের ব্যক্তি অফিসার হিসাবে অপদার্থ ছিল, এ কথা সদরের কালেকটরেটে সবারই জানা আছে। উপরন্তু সে ছিল উত্তরের পার্বত্য জেলার মানুষ। অশোকদের নিজস্ব মহলে যাদের কোড-নাম 'নেপু'। ইদানীং হিমালয়ের পার্বত্য জাতিগুলির প্রচুর ছেলে বিশেষ কোটায় ডবলিউ বি সি এস চাকরিতে এসেছে। তাদের মধ্যে বেশ-কিছু ছেলে অকর্মা এবং ফাঁকিবাজ হিসাবে চাকরির শুরুতেই নাম কিনেছে। পানজোড়া ব্লকের পূর্বতন জনৈক জিম্বা বড়োবাবুর ভরসায় অফিস করত এবং বাড়িয়ে দেওয়া যে-কোনো কাগজে সই করত। তার উদ্দেশ্য ছিল একটাই, কোনোরকমে মেয়াদ শেষ করে এবং মুরুব্বি ধরে দার্জিলিংয়ে গিয়ে খুঁটি গেড়ে বসা। সে প্রচেষ্টা তার সার্থক হয়েছে এবং অশোকের জন্য বেশ-কিছু পাপ সে ফেলে রেখে গেছে। কাঞ্চনপুরের কুয়ো খোঁড়া তার মধ্যে একটি। অশোক বলে. টাকা দেওয়ার মালিক কি আমি? টাকা যখন আসবে, তখন পাবেন। আগে যে টাকা দেওয়া হয়েছিল তার হিসাব ঠিক আছে তো?

—হঁ, সি তো কেরানিবাবুই ক'বা পারবেন। কি কেরানিবাবু, খাতা-কাগজ ঠিক করেন নাই?

অশোক বলে, আপনি আসার আগে আমি ক্যাশবই দেখছিলাম। ক্যাশবই তো হাল পর্যন্ত লেখা নেই! এখনো দু'মাসের মতো লেখা বাকি আছে।

—ক্যান্? কেরানিবাবু, ক্যাশবই লিখা বাকি ক্যান্?

কেরানি আসলে প্রধানের সেক্রেটারি, সরকারি চাকুরে। সে সরোষে বলে, ক্যাশবই লিখব কি ঘাস-বিচালি দিয়ে? কতদিন ধরে বলছি খরচের ভাউচারগুলো দিন, সে ব্যাপারে কারুর কোনো গরজ নেই—

—ক্যান্? মেম্বাররা ভাউচার দেয় নাই?

কেরানি বিরক্তিতে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকে। সম্ভবত ভয় অথবা অন্য কোনো কারণে সে প্রধানকে বি ডি ও-র সামনে বেশি হেনস্থা করতে চায় না।

চৌকিদার কেটলিতে করে চা এবং হাতে ঝুলিয়ে কয়েকটা কাপ নিয়ে আসে। প্রধান বলে, আচ্ছা—আচ্ছা, ইসব আমি দেখমো। কাম করিছে, ভাউচার দিবে না ? নেন, চা খান, বি ডি ও সাহেব। ও নিয়া আপনে ভাববেন না। ওসব সোমায় মত আমি ঠিক করি দিমো।

চা দেওয়ার পর হরেন পকেট থেকে এক প্যাকেট বিস্কুট বের করে। অশোক সভয়ে দেখে, সেই বিস্কুট যা এই ব্লকের সর্বত্র পাওয়া যায়। দেখতে বিস্কুটের মতো কিন্তু খেতে নয়। প্রত্যেকটা বিস্কুটের ভিতরে বালি কিচকিচ করে। সে হাতের ইশারায় হরেনকে বিস্কুট দিতে না করে।

চা খেতে খেতে অশোক বলে, ক্যাশবই এক সপ্তাহের মধ্যে ঠিক করে ফেলবেন কেরানিবাবু, আমি দেখব। আর প্রধান সাহেব, গতবছরের স্কিমে ক'টা কুয়ো খোঁড়া হয়েছিল আপনার অঞ্চলে ?

এই প্রথম অমরনাথের চোখে ঈষৎ অস্বস্তি দেখে অশোক। কিন্তু সে শুধু ক্ষণিকের আভাস। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, ক'টা য্যান, কেরানিবাবু ? কেরানি বলে, প্রতি মৌজায় একটি করে আর কাঞ্চনপুরে দুটো, এই নিয়ে মোট তেরোটা।

প্রধান বলে, হাঁ, ওই তেরোটা।

অশোক বলে, আমি দু-একটা কুয়ো দেখব, প্রধান সাহেব। অমরনাথের চোখে এবার স্পষ্ট অস্বস্তি। সে বলে, সিতো একবছর আগের কথা। কুয়া খোঁড়া হল, ওভারসিয়ার বাবু আসে সব দেখে গেলেন। ফের আপনার দেখার দরকার ?

অমরনাথ তার কণ্ঠের বিরক্তি বিস্ময় দিয়ে প্রকাশ করে। অশোক বলে—হ্যাঁ, দেখবার দরকার। কিছু অভিযোগ গেছে।

অমরনাথ ঘরের বাইরের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কের মতো

গলার কাঠির মালায় হাত বোলায়। মুখে বলে, বেশ তো, দেখবেন। হরেনকে সাথে নিয়া যান।

—হরেন কেন? আপনিই চলুন। গাড়ি আছে, অসুবিধা তো নেই?

—আমি? বেশ। আমিও যাবার পারি। তা অভিযোগ কে করিছে, বি ডি ও সাহেব?

—অভিযোগ করেছে আপনাদের বিরোধীপক্ষ। নাম তো সবার মনে নেই।

—অ। তো ঠিক আছে। আপনি বসেন। আমি এ্যালা চ্যান-খাওয়া সাইরে আসি। কতক্ষণ ফের লাগাবেন।

অনুমতির প্রয়োজন নেই, অমরনাথ উঠে বাইরে যায়। চৌকিদারকে বলে—হরেন, গেরস্থানি যে খড়ি ফাঁড়বা কইছিল, ফাঁড়িছিস?

—সময় পালাম কই? সকাল থিকা তো তোমার পাছোৎ নাইগে আছি!

—অ। তা যা। আগে খড়ি ফাঁইড়ে ফের এঠি আইসে বসেক। বি ডি ও সাহেবের কিবা লাগে না লাগে দেখেক।

অমরনাথ চলে যায়। বিনয় বলে, দেখলেন তো স্যার? বলছিলাম-না জিনিস একখানা!

কেরানি বলে, অঞ্চলে কাজ করা যে কী ঝকমারি ব্যাপার হয়েছে স্যার, কী বলব? নিয়মকানুন, কাগজপত্তরের ধার কেউ ধারবে না, গুরুত্বও বুঝবে না।

অশোক এই লোকটির অসুবিধা বোঝে। বস্তুত পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে তার যে অবস্থান, গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে এই লোকটিরও প্রায় সেই অবস্থান। তফাতের মধ্যে এই, সে একজন অফিসার এবং তার আছে দীর্ঘদিনের মোটামুটি সংগঠিত একটা পুরো অফিস।

একটার পর একটা সিগারেট পুড়িয়েও অশোক সময় শেষ

করতে পারে না। একজন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের জন্য একজন ডেপুটির প্রতীক্ষা, অশোক এই ভাবেই দেখে ব্যাপারটাকে। অমরনাথ নামের লোকটা তার স্বাধীনতা খর্ব করেছে। ঐ রকম একটা লোক! ভিতরে জ্বালা এবং আক্রোশ বোধ করে সে।

এভাবে ঘণ্টাদুয়েক পার হয়ে যেতে সে ক্রমশ হতাশ হতে থাকে। সে উসখুস করে। কেরানি আড়চোখে তাকে লক্ষ্য করে বার বার। স্বীকার করতে কষ্ট হয়, তবুও স্বীকার করতেই হয় যে অমরনাথ তাকে প্রায় শারীরিক নিপীড়নের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। কেননা, দু' ঘণ্টা সময়টা কম নয়।

এমন সময়ে হরেন আসে। অশোকও ঠাণ্ডা গলাতেই তাকে প্রশ্ন করে, খড়ি ফাঁড়া হল, হরেন? হরেন একটু থতমত খেয়ে উত্তর দেয়, হুঁ, ছার।

—তোমার প্রধান সাহেব গেলেন কোথায়?

—ক্যান্, আসে নাই?

—প্রধানের বাড়ি কতদূর এখান থেকে?

—ওইতো, ছার। ইখান থিকা পাঁচ মিনিটের রাস্তা।

—গাড়িতে ওঠো। চলুন বিনয়দা।

অমরনাথ বাড়িতে এসে খাওয়াদাওয়া করে দিবানিদ্রা দিয়েছে। তার এক চাকরের কাছ থেকে একথা জানা যায়। অশোক অসভ্যের মতো জীপের হর্ন টিপে ধরে রাখে। সেই শব্দে অমরনাথের বাড়ির মাটির পাঁচিলের সঙ্গে বাঁধা গোরু মোষ চঞ্চল হয় এবং বিপদের আশঙ্কায় সতর্ক হয়ে থাকে।

অমরনাথ ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে অশোক হর্ন ছেড়ে দেয়। খালি গা অমরনাথের, গলা ও বগল বেয়ে ঘাম নেমেছে। স্পষ্টতই সে ঘুমোচ্ছিল। সে যথার্থই বিব্রত এবং একটু সন্ত্রস্তও বোধ হয়। অশোক কিছু বলে না। চুপ করে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

অমরনাথ বলে, আসেন বি ডি ও সাহেব, ঘরেৎ আসেন। খাই-দাইয়ের পর গা গড়াতেই কখন চোখ বুজে গেছে, ট্যার পাই নাই। ক'টা বাজে এখন ?

অশোক বলে, তিনটে। না, ঘরে যাব না। আপনি আসুন. যে কাজে এসেছি সেটা শেষ করি।

—আচ্ছা থামেন, আমি জামাটা গায়ে দিয়া আসি।

অমরনাথ জামা গায়ে দিয়ে একটু পরে বেরিয়ে আসে। অশোক তাকে পাশের জায়গা ছাড়ে না। অগত্যা প্রধান পিছনে গিয়ে চৌকিদারের পাশে বসে। সামান্য সময়ের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতায় প্রধান জীপের সামনে বসা ও পিছনে বসার তফাত বুঝতে শিখেছে। এখন তার মুখ দেখে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। আর অশোক তার এতক্ষণের নিপীড়ককে কড়ায়-গণ্ডায় সব ফিরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর।

সে বলে, প্রথমে কোথায় যাব প্রধান সাহেব ?

অমরনাথ বলে, যেথা খুশি। এই কাঞ্চনপুরেই তো দুটা আছে।

—কাঞ্চনপুরের দুটো পরে দেখব। আপনার মৌজা তো কাঞ্চনপুর, ছাট্‌না, বৈকুণ্ঠ, তুলসীপুর—

অশোক প্রায় সবগুলো মৌজার নামই বলে ফেলে। তারপর নিজেই চৌকিদারকে ছাট্‌নার রাস্তা দেখাতে বলে।

ছাট্‌না গ্রামে ঢোকার পর এক চৌমাথায় চৌকিদার গাড়ি থামাতে বলে। গাড়ি থামলে অশোক আগে নামে, তারপর অন্যরা।

অশোক বলে, কই চৌকিদার, কুয়ো কই ?

চৌকিদার প্রধানের দিকে তাকায়। প্রধান হঠাৎ সাহসী হয় এবং বলে, আসেন—ইদিকে।

তারা একটা বাড়ির দিকে এগোয়। গাড়ি এবং পোশাক পরা লোকজন অনেক শিশু ও কিছু বয়স্ক মানুষকে আকৃষ্ট করে।

অমরনাথ বলে, আসেন ইদিকে, এই যে কুয়া।

অশোক কাছে এগিয়ে একটা তিন-চার হাত গভীর গর্ত দেখে,

তাতে জল থাকতেই পারে না। কাজেই সে সম্ভাবনার কথাও তার মনে আসে না।

—এর নাম কুয়ো ?

—কাঁচা কুয়া খোঁড়ার অডার হছিল। পলি জায়গা, তাৎ মাটি পড়ে বসি গিইছে।

অশোক সহসা কিছু বলতে পারে না। এসব কারণেই বিনয়কে তার অভিভাবক বানানো। বিনয় তার পাশ থেকেই গর্তে উঁকি দিয়েছিল। সে মুখ তুলে প্রধানের কথা শোনে এবং ভিড়ের মধ্যের একজন বয়স্ক মানুষকে ডাক দেয়, ও মশাই শুনুন।

লোকটি একটু ইতস্তত করে এগিয়ে আসে। বিনয় তার হাত ধরে গর্তটার কাছে নিয়ে যায়, আঙুল দিয়ে নীচের দিকে দেখিয়ে বলে, এটা কী জিনিস ?

লোকটি নির্দ্বিধায় বলে, আজ্ঞে—কুয়া।

বিনয় বলে, এতে জল উঠেছিল ?

লোকটি প্রধানের দিকে একবার তাকিয়ে বলে, আজ্ঞে উঠিছিল বোধায়।

অশোকের এখনো ধারণা গ্রামের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ খুবই সরল সোজা আর বোকা এবং অমরনাথের মতো মানুষেরাই হচ্ছে শোষক ও বজ্জাত। এই ধারণাতেই সে এই লোকটিকে বিচার করছিল। কিন্তু বিনয়ের সঙ্গে তার পরবর্তী সংলাপে সে রীতিমত চমৎকৃত হয়।

বিনয় বলে, এটাকে কুয়ো না বলে যদি আমি সরোবর বলি, আপনার কোনো আপত্তি আছে ?

লোকটি চোখ পিটপিট করে বলে, সরোবর কী জিনিস, ডেরাইভার সাহেব ? তাৎ যদি জল থাকে, তবি মোর আপত্ত নাই।

অশোক সশব্দে হাসে। বলে, হেরে গেলেন বিনয়দা।

বিনয় কদাচিৎ হাসে, হয়তো সপ্তাহে দু-একবার। এই ঘটনা

তার হাসির ভাণ্ডারে একটি অতিরিক্ত সংযোজন হয়। সে হেরে গিয়েও বেশ আনন্দ পেয়েছে, বোঝা যায়।

হেসে বিনয় গাড়িতে উঠে ব'সে স্টিয়ারিং ধরে। অশোক পাশে উঠে বসে। হাসির কারণ ঘটলেও ভিতরের বিরক্তি এবং ক্রোধ সে দমন করতে পারে না। বলে, ছেড়ে দিন গাড়ি। শালা চোর, যাক এখান থেকে হেঁটে।

বিনয় বলে, না না, সেটা ঠিক হবে না স্যার।

অশোক বলে, ডাকুন তবে।

বিনয় প্রধান এবং চৌকিদারকে ডেকে গাড়িতে তুলে নেয়। কাঞ্চনপুরে এদের নামিয়ে গাড়ি ফেরার পথ ধরে। পথে তিনটা গ্রামে অশোক কুয়োর খোঁজ করে আরো উত্তেজিত হয়। একটা গ্রামে অনুরূপ একটা গর্ত আছে, আর-ছুটোতে তাও নেই।

বৈকুণ্ঠতে রাস্তার পাশে একটি লোক হাত তুলে তাদের গাড়ি থামায়। লোকটির খালি গা, যতটা সম্ভব উঠিয়ে মালকোঁচা দিয়ে ধুতি বাঁধা। মাথায় একটা মাথাল, যার ব্যাস কম করে তিনফুট। লোকটির অসম্ভব শক্তিশালী চেহারা অশোককে আকৃষ্ট করে এবং মুখের দিকে তাকিয়ে মানুষটাকে তার চেনা লাগে।

গাড়ি থামলে মানুষটা কাছে এসে হাত তুলে নমস্কার করে।

—নমস্কার ছার, মোর নাম সুপিন বর্মন।

—নমস্কার। হ্যাঁ, চিনতে পারছি। তা কী খবর?

সুপিন অমরনাথের পার্টির লোক, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। সমিতির মিটিং-এ তাকে একদিন দেখেছে অশোক।

—মোর একখান আর্জি আছে ছার। আগের বিডিওক্ বইলে বইলে হয়রান হই গিছি।

—আপনি পঞ্চায়েত সদস্য, আমার কাছে কী আরজি?

—কথাখান কি, মোর বাপ উপিন বর্মন তে-ভাগা লড়াইয়েৎ বন্দুকের গুলি খায়ে মরে। মোর তখন বারো-চোদ্দ বছর বয়স।

—তাই!

—তে, সিই যে ক'বচ্ছর আগে তে-ভাগার উৎসব হল না সদরোৎ, তাৎ মন্ত্রী আসিছিল?

—হ্যাঁ?

—তাৎ হামাহোরের দু তিনজনা প্যানসন পাইছে।

—ও।

—মোরও পাবার কথা ছিল। কিন্তু কপাল মন্দ, কোঠে যি কি ফের গণ্ডগোল হয়া গেল, প্যানসন আটকা গেছে।

—আচ্ছা।

—তে আপনে যদি ছার এনা দয়া করে মোর প্যানসনটা উদ্ধার করে দ্যান—

অশোক একটু অবাক হয়। বলে, এতে আমার কী করার আছে? এ তো আপনার পার্টির হাতে!

—পার্টিক্ ক'য়ে ক'য়ে তো জেরবার হোই গেলাম। পার্টি কহে, ইসব নাকি আপনাহোরের হাতে। আফির দ্যাখেন, পার্টি মোক ইবার ভোটেৎ দাঁড়া করালো, জিতলামও, কিন্তু প্যানসনের টাকা পালাম না।

অশোক হেসে বলে, না না, এ-সবে আমাদের কিছু করার নেই। আপনি বরং আপনার জেলা নেতাদের ধরুন-না?

সুপিন খুব হতাশ হয়। তবুও শেষ অনুরোধ রাখে। বলে, দেখেন ছার যদি আপনাহোরের হাতেৎ কিছু থাকে—

অশোক নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য বলে, ঠিক আছে, আমি সদরে খোঁজ নেব। যদি অফিসে কোথাও আটকে থাকে তাহলে সেটা দেখব।

সুপিন খুশি হয়। বলে, তাই দেখেন ছার। আচ্ছা, নমস্কার ছার।

রাস্তাটা একটু এগিয়ে বাঁ দিকে বেঁকে মাঠের মধ্য দিয়ে এগিয়ে

গেছে। গাড়ি ঘুরলে অশোক অনেকক্ষণ ধরে সুপিনের বড়োসড়ো চেহারা এবং বিশাল মাথালটি দেখে।

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনাদির সঙ্গে অশোকের বিরোধ হয়েছিল এখানে আসার দিন-পনেরোর মধ্যে। অনাদির একখানা মোটর সাইকেল আছে। মোটর সাইকেল কেনা হয়েছিল সরকারি টাকায়। অশোক অবাক হয়ে দেখেছিল, তার আগের বি ডি ও জিম্বা এটাও বে-আইনিভাবে বন্দোবস্ত করেছে। একটি উন্নয়ন খাতের টাকা এভাবে মোটর সাইকেল কেনায় খরচ হয়েছে। জিম্বা হয়তো ব্যাপারটা বোঝেইনি অথবা জানেই না, শুধু কাগজে সই করেছে, এমনও হতে পারে।

অনাদি প্রতিদিন মোটর সাইকেল নিয়ে ব্লকে আসে এবং জীপ থেকে দু'লিটার করে পেট্রল ঢেলে নেয়। তার কপালগুণে ব্লকের জীপটি পেট্রল-চালিত।

এ নিয়ম এতদিন চলছিল। কেউ কোনো বাধা দেয়নি। অশোক প্রথম প্রথম কয়েকদিন দেখে শেষে ব্যাপারটা বন্ধ করে। সে জানত, এ নিয়ে সভাপতির সঙ্গে সরাসরি রেষারেষিতে যেতে হতে পারে। তা সত্ত্বেও সে পেছোয়নি। সে বিনয়কে বলেছিল, চেয়ারম্যান তেল চাইতে এলে তেল দেবেন না, আমাকে জানাবেন।

আর অনাদি প্রথমত নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারে না। তেল দেবে না বলেছে? নতুন বি ডি ও নিজেকে কী ভেবেছে? নিজের ঘর থেকে উঠে সে অশোকের ঘরে আসে। সরাসরি প্রশ্ন করে, গাড়ি থেকে তেল নিতে না করেছেন আপনি?

অশোক বলে, হ্যাঁ। প্রতিদিন দু'লিটার তেল যদি আপনি তুলে নেন, তবে আমরা লগবুক কীভাবে মেনটেইন করব? একদিনে দু'লিটার মাসে মাসে ষাট লিটার। তার অর্থ—মাসে পাঁচশো কিলোমিটার রাস্তা! কীভাবে হিসাবটা ম্যানেজ করব? তাছাড়া সরকার তেলের জন্য টাকার কোটা আগের থেকে অনেক কমিয়ে দিয়েছে।

অনাদি এ-সব ব্যাখ্যা শুনেছে কিনা সন্দেহ। বলেছে, ও! তাহলে তেল দেবেন না?

অশোক তখন একটু উত্তপ্ত হয়েছে। বলেছে, না, দিতে পারব না। আরেকটা কথা আপনাকে বলি। পঞ্চায়েত নিয়মাবলীতে চেয়ারম্যানের গাড়ি রাখার কোনো ব্যবস্থা নেই। আপনার যদি অফিসিয়াল কাজে গাড়ির প্রয়োজন হয়, আপনি ব্লকের গাড়ি ব্যবহার করতে পারেন, তাতে অসুবিধা নেই। আপনি যে ডেভেলপমেণ্টের টাকায় মোটর সাইকেল কিনেছেন, এই পুরো ব্যাপারটাই বে-আইনি হয়েছে।

অনাদি অস্বস্তিকর স্তব্ধতা তৈরি করে বলে, তাই নাকি? আপনার কাছ থেকে আইন-কানুনও শিখতে হবে?

অশোক খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। ঠিক এই পর্যায়ে পরিস্থিতি চলে যাক, তা হয়তো সে চায়নি। কিন্তু এখন আর ফেরার উপায় নেই। দুই পক্ষের একজন যদি দন্ত প্রদর্শন করে, তবে তার আস্ফালন অন্যজনের দন্তকেও টেনে বের করে।

সে বলে, আমার কাছ থেকে শিখতে তো হবেই, সে কারণেই আমাকে আপনার এক্সিকিউটিভ অফিসার করা হয়েছে। আপনি যদি ভুল করেন, তবে তার প্রাথমিক এবং বেশ-কিছুটা সময় পর্যন্ত ব্যাখ্যা আমাকেই করতে হবে। অবশ্য এই মোটর সাইকেল কেনার ব্যাপারটা আমার সময়ে পড়ছে না, এটা আমার একটা ভরসা।

—ভরসা! হাহ্ হা, ভালো বলেছেন।

অনাদি নাটুকে ভঙ্গিতে হাসে। আগাগোড়াই সে চিবুক টেবিলের দিকে ঝুঁকিয়ে এবং টেবিলে দুই হাতের ভর রেখে অশোকের সঙ্গে কথা বলেছে। এতে সে চোখ উপরের দিকে তুলে অশোকের মুখে তাকাতে পারছে এবং একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি আনতে পারছে।

ফলে অশোক ভিতরে ভিতরে আরো উত্তেজিত হয়। এ লোকটাকে আর বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়, এরকম একটা রেষারেষিও বোধ করে সে।

অনাদি বলে, বেশ বেশ। তা যাক্‌গে ও-সব কথা। শুনলাম কালভার্টের ওয়ার্ক অর্ডার দিতে নাকি নিষেধ করেছেন?

অশোক বলে, হ্যাঁ। যে ঠিকাদারের টেণ্ডার আমরা অ্যাকসেপ্ট করেছি, তার ক্রিডেনশিয়াল দেখতে চেয়েছি আমি। আর একটা সার্টিফিকেট চেয়েছি যে এর আগে অন্তত লাখটাকার কাজ সে এক-সঙ্গে করেছে।

অনাদির মুখ ভীষণ হয়। বলে, তার মানে তেলা মাথায় তেল ঢালা। যে বড়ো ঠিকাদার, সে-ই শুধু বড়ো কাজ পাবে! আপনি তো দেখছি ডেভেলপমেণ্টের কাজ সব বানচাল করে দেবেন!

ঘটনার সঙ্গে তার অন্তর্ভুক্তি কতখানি হচ্ছে, অশোক তখনো তা টের পায়নি। শুধু তার জেদ বাড়ছিল। সে বলেছে, সরকারি যা নিয়মকানুন আছে, আমি শুধু সেটুকুই দেখার চেষ্টা করছি। কাজটা যাকে দেব, সে করতে পারবে কিনা—এটাও দেখতে হবে।

টেণ্ডার নেওয়া হয়েছিল অশোক আসার আগেই। তারপর জিম্বার বদলি এবং অশোকের কার্যভার গ্রহণ, এইসব ঝামেলায় ওয়ার্ক অর্ডার বন্ধ ছিল মাস দেড়েক। অনাদির সঙ্গে এই পর্যায়ে কথা বলার আগ পর্যন্ত অশোক এই টেণ্ডার সম্পর্কিত আর কোনো বৃত্তান্ত জানত না।

এ ঘটনার পর বিনয় বলেছিল, স্যার, বড়ো কঠিন জায়গায় হাত দিয়েছেন। আপনি নতুন বলেই বলছি। সব-কিছু জানলে হয়তো—

টেণ্ডার পেয়েছে বিপ্লব, সদরের এক বড়ো নেতার ভাইপো। নেতা বিয়ে করেনি এবং ভাইপোটি তার বড়ো আদরের। টেণ্ডার গ্রহণের দিন দশ-বারোজন ঠিকাদার এসেছিল। আজকাল জেলাগুলোতে উন্নয়ন খাতে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়। এই টাকার প্রায় যাবতীয় কাজ করে ক্রমশই বেড়ে ওঠে ঠিকাদার গোষ্ঠী। এরা এদের নিজস্ব নিয়মকানুনও বেশ ভালোরকম তৈরি করে নিয়েছে। আগে থাকতেই ঠিক ছিল কাজটা কে নেবে। চুক্তিমতো 'প্যাক্ট-মানি' নিয়ে সে

হাজির ছিল। হাজির ছিল অন্যরাও। 'প্যাক্ট-মানি'র পরিমাণ তিরিশ হাজার টাকা। ফর্ম সবাই জমা দেবে, তবে চুক্তিমতো নিম্নতম কোটেশন হবে তারই যে ঐ তিরিশ হাজার টাকা অন্যদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেবে। এছাড়া ভাগ একটা বেশি হবে, সেটা থাকবে অফিসের সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার-এর জন্য, কেননা কাজটা তো সেই দেখাশোনা করবে। এ নিয়ম এখন সর্বত্র।

কিন্তু পানজোড়ায় ব্যাপারটা অন্যরকম ঘটে যায়। এই অন্যরকমটাও মাঝেমধ্যে ঘটে। বিপ্লব বড়ো নেতার ভাইপো, সে কারণে ঘাড়ে তার তুটো মাথা। তার ভাড়া-করা গুণ্ডা রিভলবার দেখিয়ে সবার হাত থেকে টেণ্ডার ফর্ম কেড়ে নেয়। ফর্ম জমা পড়ে একটিই, সেটি বিপ্লবের।

অশোক যুবক হয়েছে সত্তরের দশকে। সত্তরের দশকে যারা যুবক হয়েছে, তাদের মধ্যে একটা অংশ অবশ্যই দশকের কাছ থেকে নৈতিকতা ও সাহসিকতার শিক্ষাটা পেয়েছে। এরকম এর আগে কখনো হয়েছে কিনা সন্দেহ। বিনয়ের মুখ থেকে সবিস্তারে শোনার পর নিজের নিরাপত্তার কথা তৎক্ষণাৎ ভাবে না সে। সে ভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধঃপতনের ব্যাপকতার কথা। তার রোখ বাড়ে।

অনাদির সঙ্গে এ-সব কথাবার্তা বলার দিন-তিনেক পরে বিপ্লব আসে। আর দশজন ঠিকাদারের থেকে চেহারাটা একটু বেশি সম্মানীয় ও স্বতন্ত্র করার প্রচেষ্টা বড়ো প্রকট তার চোখেমুখে। দামী ভারী খদ্দরের পাঞ্জাবী তার গায়ে। চোখে একেবারে হালের সরু ফ্রেমের চশমা। বেশ সপ্রতিভ চেহারা। জেলার এক শ্রদ্ধেয় নেতার ভাইপো। চেহারা দেখে মনে হয়, হয়তো এ ব্যক্তিও লিটল-ম্যাগাজিন আন্দোলন করেছে বা এখনো করে। হয়তো কবিতাও লেখে। অশোক বড়ো বিমর্ষ হয়ে এ-সব কথা ভাবে।

কিন্তু সে কতক্ষণ ? যাবৎ ন ভাষয়েৎ।

বিপ্লব কথা বলে এমন এক ভাষায় যা এইসব জেলার শহরাঞ্চলে বেশ চালু আছে। পূর্ববঙ্গ, স্থানীয় এবং শুদ্ধ বাংলার এক অশুদ্ধ চলতি মিশ্রণ। শুনতে খুব খারাপ লাগে।

—আপনে নাকি আমার টেণ্ডার ক্যানছেল করছেন? (আঃ! স্বস্তি। তাহলে এ লিটল-ম্যাগাজিন করে না। কবিতা লেখে না!)

—ক্যানসেল তো করিনি। আপনার ক্রিডেনশিয়াল এবং সার্টিফিকেট চেয়েছি।

—আপনে মশায় প্যাঁচ করত্যাছেন।

—প্যাঁচ!

অশোকের ভ্রূ কুটিল হয়। গলা চড়াতে ইচ্ছা হয়। তবুও মেজাজ সংযত রাখে সে।

—প্যাঁচ কী রকম? আইনে যা আছে, তাই দিতে বলেছি আপনাকে। প্যাঁচ কেন বলছেন?

—বলত্যাছি এইজন্য যে এইসব ঝামেলায় কাজটা খালি দেরি করাবেন। আটকাবার পারবেন না।

—আচ্ছা সে দেখা যাবে। আপনাকে যা দিতে বলেছি, সে-সব দিন, তারপরে দেখা যাবে। আসুন এবার। অশোক শেষ পর্যন্ত আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না এবং এভাবে বিপ্লবকে খারিজ করে।

যাওয়ার আগে বিপ্লব তাকে খুব ঠাণ্ডা গলায় শাসিয়ে যায়। বলে, ওয়ার্ক অর্ডারটা দিলেই ভালো করতেন।

অশোকের জানালায় পর্দা আছে। তবে পর্দাগুলো কোনোমতে দড়ি দিয়ে টাঙানো। কাজেই তাতে ফাঁক থাকে। সেই ফাঁক দিয়ে সে দেখে ব্লকের সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পরিমল বিপ্লবকে নিয়ে গিয়ে চায়ের দোকানে বসে। একা ঘরের মধ্যে বসে অশোক গরম নিশ্বাস ফেলে তারপর দেয়াল দেখে। সবদিকের দেয়ালেই ব্লকের বড়ো বড়ো উন্নয়নের ফোটোগ্রাফ। বুঝতে যাতে অসুবিধা না হয়,

প্রত্যেক ফোটোর নীচে কালো কালির সুন্দর হরফে উন্নয়নটি কিসে হ'ল এবং কারা করল যথাসম্ভব সবিস্তারে লেখা। আগের বি ডি ও, তারও আগের বি ডি ও, জেলাশাসক ইত্যাদিরা আছে এইসব ছবিতে। একটিতে একজন মন্ত্রীর উপস্থিতিও আছে। হঠাৎ তার সুপিন বর্মনের কথা মনে হয়। বাপ যার লড়াইতে মরেছে, তে-ভাগার মতো ইজ্জতের লড়াই, অন্তত তিনফুট যার মাথালের ব্যাস, সেই সুপিন বর্মন শুধু এখন বাপের মৃত্যু বাবদ পেনসনটা চায়!

সে মাথা ঘুরিয়ে পিছনের দেয়ালে তাকায়। পুরোনো বাড়ির ড্যাম্প-ধরা দেয়ালে গান্ধীর ছবিতেও ড্যাম্প। ছবিখানা এখন প্রাচীন উদ্ভিদের জীবাশ্মের মতো দেখায়। ডানদিকের দেয়ালে জওহরলাল নেহরুর রোগা চেহারা, একখানা অত্যন্ত সাধারণ কাঠের চেয়ারে উপবিষ্ট। এরকম তুলনা খুবই অর্থহীন, তবুও তার মনে হয়, তার নিজের চেয়ারখানা ঐ চেয়ারের থেকে অনেক দামী। পিছিয়ে, এগিয়ে, দোল খেয়ে এবং স্প্রিং-এর ঠেকায় একদম চিৎ হয়ে থেকে অশোক একথা যেন প্রমাণ করে। এ-সব মহার্ঘ চেয়ার টেবিল এবং অন্যান্য আসবাব মার্চ মাসের অবদান, যখন বাজেটের টাকা খরচ হয় না। তবুও ব্লকের ব্যবস্থা অতি সামান্যই, সদরের কালেকটরেটে অঢেল।

বাড়িটার অন্যপ্রান্তে সভাপতির চেম্বার। সেখানে চেয়ার টেবিল আরো মনোহর, নতুন। সেখানকার দেয়ালে চওড়া ফ্রেমের বড়ো বড়ো আকারের ছবি—মার্কস, লেনিন, হরেকৃষ্ণ কোঙার। কিন্তু বাড়িটা তো সেই কবেকার, সর্বাঙ্গে যার নোনা আর ঘুণ। কাজেই মার্কস, লেনিন, হরেকৃষ্ণ কোঙার অচিরেই নোনা আর ঘুণের শিকার হয়ে গেছে।

তার ক্রোধ, অভ্যন্তরস্থ শ্লেষ, হতাশা, উপমা-তুলনা, এ সবও তাকে অসুখী করে। কোনো একটা নির্দিষ্ট ঘটনায় সে হয়তো একজন প্রতিপক্ষ পায়, কিন্তু অচিরেই সেই ঘটনা সাধারণ ঘটনা হয়ে যায়। তখন তার হতাশা বাড়ে। বাড়ে অশান্তি এবং সেইসঙ্গে মানসিক

চাপ। কেননা ঘটনা যখন সাধারণ হয়, ব্যাপক হয়, তখন কোনো মানুষই, যেখানে অশোক দাঁড়িয়ে, ব্যতিক্রম থাকতে পারে না। ফলে, ব্যতিক্রম এবং বিধি একটা স্থূল পর্যায়ে এসে একাকার হয়ে যায়। তখন মনে হয়, ধু-স্-সা-লা!

তখনই অত্যন্ত জীর্ণ বসন-পরা একটি মলিন-মুখ কিশোরী কোলে ততোধিক মলিন ও শীর্ণ একটি শিশু নিয়ে পর্দা ঠেলে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। অনন্ত কাল ধরে যে হাতখানা সামনে বাড়ানো আছে, ঠিক সেই হাতখানাই তার শতচ্ছিন্ন, লজ্জা আড়াল করতে অক্ষম বস্ত্রখণ্ড ভেদ করে সামনে বেরিয়ে আসে। একখানা রিলিফের কাপড় চাই। কাপড়টা যে কত জরুরি, সে-কথা বোঝাবার জন্য বালিকা হাতখানা বের করেছে অঙ্গবস্ত্রের একটা অসাধারণ ফোকর থেকে।

তাকিয়ে দেখতে অশোকের সংকোচ হয় না। এই ক্ষেত্রে সংকোচ হওয়ায় দুটো কারণ থাকতে পারত। একটাকে ধরা হয় সাধারণ মানবিক—প্রায় বস্ত্রহীন কিশোরীর দিকে তাকানোতে যে বোধ চোখকে বিব্রত করে, শাসন করে। আরেকটি বোধ গত কয়েক দশক ধরে ক্রমাগত চর্চার ফলে এখন অত্যাধুনিক, নতুন মাত্রাযুক্ত, এবং (হায়!) হয়তো আরোপিতও—মানবিক! অর্থাৎ হায়, আমারই অনুরূপ একজন মানুষের—আমারই অনুরূপ একজন মানুষের লজ্জা—আমারই অনুরূপ একজন মানুষের লজ্জা নিবারণের জন্য কাঙালপনা আমারই অনুরূপ একজন মানুষের অথবা আমারই কাছে!

এইভাবে একই শব্দ, শুধুমাত্র শব্দ, বারংবার ব্যবহারে মানবিক চেতনা ছাড়িয়ে ক্রমশ বৌদ্ধিক উপলব্ধির নির্মম বধির দেয়ালে অর্থহীন। যেমন, তার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট জেলাস্তরের সমন্বয় কমিটির মিটিং-এ প্রায়ই একটা কথা খুব আবেগ দিয়ে বলে। কোথাও শোনা অথবা পড়া একটা কথা। কথাটা হল—দারিদ্র্যসীমার নীচের মানুষকে পরিসংখ্যান দিয়ে নয়, চিনতে হবে, বুঝতে হবে, মানুষটার মুখে কতগুলো বলিরেখা পড়েছে, তা গুনে। বলিরেখা এবং রিংক্‌ল্‌স্‌,

এই শব্দদুটো দিয়ে সে তার বক্তব্যকে খুব সংবেদনশীল এবং ভীষণ হৃদয়গ্রাহী করার চেষ্টা করে উচ্চারণে, ধ্বনির তারতম্যে এবং চোখ ও ভুরুর ভঙ্গিতে। অথচ প্রতিবারই জেলার সমুদয় সরকারি অফিসার, ব্যাঙ্কের অফিসার এবং বিভিন্ন স্তরের জন-প্রতিনিধিরা এই কথায় একবার করে হাই তোলে। আবার তারপরেই কোনো বক্তা ডি এম-এর ওই কথার প্রতিধ্বনি করে, উদ্ধৃতি দেয়, যাথার্থ্য জোরদার করে। শব্দ শুধু শব্দই।

এইসব উপলব্ধি হয় তখনই, যখন অনন্তকালের হাতখানা তার আরো সামনে এগিয়ে আসে এবং সে সংকুচিত হয় না। বরং সে খেঁকিয়ে ওঠে, চেঁচিয়ে পিওনকে ডাকে, ঝামেলা হঠাতে বলে।

কিন্তু কোনো কোনো হাত বড়ো বেশি শীর্ণ, বড়ো বেশি শিরাবহুল, কিছুতেই পর্দার ওপাশে সরে যেতে চায় না, এমন নাছোড়বান্দা।

তখন অশোক বলে, আরে ! যা—ও। কাপড় নেই বলছি না ?

হাত যায় না। কেননা, হাতের কিছু হারাবার ভয় নেই, শৃঙ্খলও নয়। শেকল মানুষ দু'ভাবে হারায়। যখন সে ভিখারি হয়, তখন তার শেকল অন্য কেউ খুলে দেয়, সে সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব বলে।

হাত বলে, আপিস থিকা ক'লো যি আচে—

—আছে বলেছে ? যাও দরখাস্ত লিখে নিয়ে এসো। এও এক খেলা। হয়তো, অফিস থেকে বলেনি কেউ এমন কথা। কিন্তু আরেকটা ভয়ংকর হৃদয়হীন সম্ভাবনা আছে। বি ডি ও-কে তাতানো যাবে। এও এক মজা। তাতে এই কঙ্কাল হাতটির সহায়তা নেওয়া যায়। বলা যায়, আরে আছে, আছে। বি ডি ও-ক্ ঠিকমত ধর, পাবু।

সেই খেলায় অশোককে পড়তেই হয়। বলতেই হয়—যাও, দরখাস্ত লিখে নিয়ে এসো।

তারপরেই চার লাইনের একখানা দরখাস্ত কেউ লিখে দেবে এবং তার বদলে—তার অঙ্গের বস্ত্রখণ্ড যতই জীর্ণ হোক, তাতে আঁচল একটুকরো থাকতেই পারে, সেই আঁচলে বিশ পয়সা, পঁচিশ পয়সা

থাকতেই পারে, যা হয়তো ঐ শিশুটির মুড়ি খাবার জন্য সে রেখেছে এবং এখন হয়তো ঐ চার লাইন লেখার মজুরি।

এমন হৃদয়হীনতা মানুষ ব্যতিক্রম হলেই করে, তবুও সেই ব্যতিক্রমও ঐ চার লাইন দরখাস্তের মজুরি যদি হয়, তখন আর পুরো ব্যাপারটা খেলা থাকে না।

দরখাস্ত আসে—অশোক দরখাস্তের উপরে নির্দেশ লিখে সই করে—ঘণ্টা টিপে পিওন ডাকে—কাগজখানা তার হাতে দেয়—কাগজ বড়োবাবুর টেবিলে যায়—বড়োবাবু, কাপড় আর নেই—এই মন্তব্য ক'রে সই করে—কাগজ আবার অশোকের টেবিলে ফিরে আসে—সেই হাত তখনো—সব বুঝেও বাড়ানো—যদি শূন্য থেকেও একখানা কাপড় পড়ে—এরকম এক অবিশ্বাস্য দৈবী আশায়। অশোক বলে, এবার বিশ্বাস হল তো? যাও এবার।

সন্ধ্যাবেলা ইরাবতীকে সে বলে, আপনাদের প্রফেশনটা বেশ। লোকের শ্রদ্ধাভক্তি এমনিতেই পাওয়া যায়।

ইরাবতী ব্লক হাসপাতালের দ্বিতীয় ডাক্তার। এ-ব্লকে অশোকের থেকে সে কয়েক মাসের পুরোনো। সে বলে, বি ডি ও হয়ে এই বুদ্ধি হয়েছে আপনার? অশোক বলে—না, ব্যাপারটা কী জানেন. বড্ড টেনসনে ভুগছি।

—টেনসনটা কিসের?

—টেনসন সমস্ত কাজে। যে ব্যাপারটায় হাত দিচ্ছি—সেখানেই গণ্ডগোল, সেখানেই কারচুপি, চুরি। সবাই যেন এক প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এক-এক সময় একটা অসম্ভব ধারণা হয় যে, এই অফিসটা —এর যাবতীয় কর্মকাণ্ড—এর মধ্যে আমি ছাড়া আর কেউই বোধ হয় সৎভাবে চিন্তা করে না। কী হাস্যকর, না?

—হাস্যকর নয়, একটু ইর্‍্যাশন্যাল বোধহয়। মানুষের উপরে বিশ্বাস হারানো পাপ, আবার মানুষের কাছে যে-কোনো অবস্থায় অনেক কিছু আশা করাও ভুল।—

ইরাবতী একটু হেসে বলে, এই দেখুন, আমার কথাগুলো বোধ হয় জ্ঞান দেওয়ার মতো শোনাচ্ছে, না ?

অশোক সেকথা খেয়ালই করে না। আগের কথার সূত্র ধরে সে বলে, আশা করা ভুল !

ইরাবতী হাসে। তার হাসিতে আত্মবিশ্বাসের অভাব। সে বলে, আমি কিছু জানি না। কথাটা মনে হ'ল, তাই বললাম। মানুষের ভীষণ লোভ যেমন আছে, অসাধারণ মহত্ত্বও আছে। নিশ্চয়ই একই মানুষের মধ্যে নয়, তবে মানুষের মধ্যেই তো।

—কিন্তু লোভী স্বার্থপর মানুষেরা সব জায়গা দখল করে আছে। আর কেউ যদি তাদের স্বার্থপর কাজকর্মে বাধা দিতে চায়, সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে। তার মানেই অশান্তি, টেনসন। আমি তো মহৎ হতে চাই না, আমি সাধারণ সৎ মানুষ হয়ে থাকতে চাই।

ইরাবতী এবার বেশ জোর দিয়েই বলে, সে কি ? আপনি সংঘর্ষে যাবেন, আর তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াগুলো আপনাকে স্পর্শ করবে না, এমন ভাবছেন কী করে ? তাহলে তো আপনার সংঘর্ষেই যাওয়া উচিত নয় ! সবই মেনে নেওয়া উচিত।

অশোক বলে, পারছি কই ? চোখের সামনে দেখেও চোখ সরিয়ে রাখব ?

ইরাবতী ডাক্তারি জেরা করে। বলে, পারছেন না কেন ? আপনাকে কেউ ফাঁসিয়ে দেবে সেই ভয়ে—না, বিবেক, মানসিকতা, অহংকার ?

অশোক বেশ-কিছু সময় চুপ করে থাকে। চুপ করে থাকে এই কারণে যে, ইরাবতী যেভাবে প্রসঙ্গটা তুলেছে, ঠিক এভাবেই সে নিজেও চিন্তা করেছে। তার মানসিক ইচ্ছা সৎ ও নিরপেক্ষ থাকা এবং কারো সঙ্গে বিরোধে না যাওয়া। অচিরেই সে বুঝেছে একই সঙ্গে সৎ, নিরপেক্ষ এবং নির্বিরোধ থাকা কখনোই সম্ভব নয়।

অশোককে চুপ করে যেতে দেখে ইরাবতী একটু উদ্‌বিগ্ন হয়।

বলে, আমার কথায় কিছু মনে করলেন না তো, অশোকবাবু?

অশোক হেসে বলে, আরে না না। আপনি ঠিকই বলেছেন। আমিও এভাবেই চিন্তা করেছিলাম। আসলে এখানে চাকরি করতে হলে বেশ জোরদার লড়াই করেই করতে হবে।

ইরাবতী বলে, সে শুধু আপনার একার ক্ষেত্রেই নয়, সর্বত্র। একটু আগেই আপনি আমাদের পেশার প্রশংসা করছিলেন না? শুনুন তবে। হাসপাতালের একটা গাড়ি আছে। আজ ছ'মাস হ'ল গাড়িটা সদরে সি এম ও এইচ নিয়ে রেখে দিয়েছেন। অথচ একটা অ্যাম্বুলেন্স্ নেই, গাড়িটা যে কী ভীষণ দরকার এখানে! কিন্তু আসল কথা সেটা নয়। আসল কথা হ'ল ওই গাড়ি বাবদ রিপেয়ার, মেন্টেনেন্স্ ইত্যাদি এখানকার খরচের পুরো টাকাটাই কিন্তু বিল হয়, পেমেণ্টও হয়। সব হাসপাতালেরই সরাসরি ওষুধ কেনার একটা কোটা আছে। এ পর্যন্ত বিশেষ কোনো ওষুধ কিনতে দেখিনি, কিন্তু বিল পেমেণ্ট নিয়মিত হয়। আর ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর টাকা-পয়সা নিয়ে যে খেয়োখেয়ি হয়, তা দেখবার মতো। আর এ-সবের সঙ্গে আমরাই জড়িত।

শেষের কথা কয়টা সে অনুচ্চে উচ্চারণ করে।

অশোক বলে, অবস্থা তো তাহলে একই রকম।

ইরাবতী বলে, দেশের সর্বত্রই এইরকম অবস্থা, আর তার ফলে অস্থিরতা। আমি আপনি যদি ভেবে নিই যে বেশ নিরাপদে, নির্বিঘ্নে বসে চাকরি করব, সেটা কি ঠিক হবে? হয়, চোরের দলে নাম লেখাতে হবে, নয়তো টেনসন মেনে নিয়ে বিরুদ্ধতা করতে হবে। এই মুহূর্তে আমি আপনাকে কয়েকটা ট্যাবলেট দিতে পারি, যাতে টেনসন কমে এবং রাতে ভালো ঘুম হয়। নেবেন?

অশোক হেসে বলে—না, তার দরকার হবে না। ধন্যবাদ। আপনি মেডিক্যাল কলেজে পড়বার সময় রাজনীতি করতেন, না?

—কেন বলুন তো?

—আপনার কথা শুনে মনে হয়।

—ওই আর কি!

কথা হচ্ছিল ইরাবতীর কোয়ার্টারে। কাজেই অশোককে এক-সময় উঠতেই হয়। ইরাবতীও ঘর ছেড়ে বাইরে আসে কথা বলতে বলতে।

সামনে খানিকটা ফাঁকা উঠোন। তার ভেতর দিয়ে রাস্তা হাস-পাতালের মূল বাড়িটার পাশ দিয়ে বেঁকে গেছে। অশোকের হাতে টর্চ আছে। সে ঘাসের উপর টর্চ ফেলে এগোয়। ইরাবতী তার পাশে পাশে আসে।

ইরাবতী বলে, আপনি আসাতে তবু একজন কথা বলার লোক পেয়েছি। আসার পর দিনকয়েক এমন দমবন্ধ লাগছিল যে, ভেবে-ছিলাম চাকরি ছেড়ে কলকাতায় পালিয়ে যাব। এখন কিন্তু আর খারাপ লাগছে না। গ্রামে না এলে বুঝতেই পারতাম না মানুষ এখনো কত সরল, মানুষের প্রয়োজন কত সীমিত হতে পারে।

অশোক বলে, আমার অবস্থাও তেমনি হয়েছিল। তবে কি জানেন, মানুষ ঠিক মানিয়ে নেয়।

ইরাবতী বলে, আমি মানিয়ে নেওয়ার কথা বলিনি অশোকবাবু, আমার কিন্তু খুব ভালো লাগছে এ জায়গাটা।

হাসপাতালের চওড়া দেয়ালে হিরাকসের হলদে চুনকাম নতুন। অশোক টর্চের ফোকাস ফেলে। আলোটা সেই দেয়ালে ঝলসে উঠে খানিকক্ষণের জন্য থমকে থেমে থাকে। কাঠকয়লা বা মাটির ঢেলা দিয়ে কেউ সেখানে লিখে রেখেছে—বি ডি ও + লেডি ডাক্তার। হরফ বেশ বড়ো।

অশোক আলো নিভিয়ে দেয়। সন্দেহ নেই ইরাবতীও লেখাটা দেখেছে। ইরাবতী চোখ নামিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘোরায়। একটা মলিন বাল্ব চওড়া দেয়ালটার এক কোণায়। অশোক সেদিকে তাকিয়ে থাকে। কী ভীষণ অস্বস্তিকর একটা নীরবতা, যা এতক্ষণের

সমস্ত সংলাপের সুস্থ অনুভূতিকে একেবারে ধুয়েমুছে দিয়েছে। এমন একটা আকস্মিক হৃদয়হীন ঘোষণা—যেন তারা উভয়ে একত্রে উলঙ্গ অবস্থায় ধরা পড়েছে।

অশোক যখন ইরাবতীর কোয়ার্টারে আসে, তখন অবশ্যই লেখাটা ওখানে ছিল না। কেননা সে দরজার কড়া নেড়ে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল এই দিকে তাকিয়ে। দেয়াল তখন পরিষ্কার ছিল। ইরাবতীও নিশ্চয়ই এ-লেখা আগে দেখেনি। দেখলে এতক্ষণে এমন স্বাভাবিক কথাবার্তা বলতে পারত না।

অশোক শব্দ ক'রে গলা পরিষ্কার করতে চেষ্টা করে। ভীষণ জড়তায় গলা খাঁকারিও যথেষ্ট অর্থবহ হয় না! এই মুহূর্তে তার যে কী বলা উচিত, অথবা তারই যদি কিছু বলার দায়িত্ব নিতে হয়, এ-সব ভাবতে ভাবতে চোরা চোখে সে ইরাবতীর দিকে তাকাতে আরো বিমূঢ় হয়ে যায়।

ইরাবতীর হাতের মুঠোয় আঁচল। সে আবেগে কাঁপছে। অশোকের ভয় হ'ল যে ইরাবতী না পড়ে যায়। সে নিজের অজান্তেই ইরাবতীর দিকে এক পা এগিয়ে যায়।

—আমি ভীষণ দুঃখিত, ডক্টর মিস সেন—অথবা আমাকে ক্ষমা করবেন, ডক্টর মিস সেন—এরকম কিছু কথা তার মুখ থেকে বের হয়, যা ইরাবতীর বাঁধের শেষ খুঁটিটা বোধহয় উপড়ে ফেলে দেয়। কেননা এই কথা বলার পর অশোক ইরাবতীর ফোঁপানো চাপা আর্তনাদ শোনে এবং ইরাবতী আঁচল মুখে চেপে নিজের ঘরের দিকে আচমকা একটা দৌড় দেয়।

অশোক আরো কিছু সময় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। বিমূঢ়, ব্যথিত, ক্রুদ্ধ কিন্তু অসহায়। তারপর সে সচেতন হয়। লেখাটা শিশুর হাতের লেখা নয়। কোনো খুব অশিক্ষিত লোকের লেখাও নয়। কেননা—কোনোরকমে সাক্ষর মানুষের লেখা ও শিশুর লেখার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকে না। সুতরাং তেমন কোনো ব্যক্তিরও নয়।

শিশুরা দেয়ালে অশ্লীল কথা লেখে কিন্তু কোনোরকমে সাক্ষর বয়স্ক ব্যক্তিরা লেখে না। কিশোরবয়সীরা সবচেয়ে বেশি লেখে, আঁকে। এমন সব কথা লেখে বা এমন সব ছবি আঁকে, যা দেখলে বয়স্ক সুস্থ মানুষের মাথাও ঝিমঝিম করে উঠতে পারে। নিষ্পাপ শিশু এবং সুকুমার কিশোর কোনো সার্বজনীন ব্যাপার নয়। শিশু এবং কিশোরেরা হামেশাই মস্তিষ্কবান বর্বর হয় যারা বয়স্কদের মনস্তত্ত্ব ভালো বোঝে, ঘাত-প্রতিঘাত আগাম আঁচ করতে পারে এবং কার্যকারণ সম্পর্কও খুব ভালো বোঝে।

এই লেখা এরকম কোনো বর্বর কিশোরের হতে পারে, কোনো ঈর্ষাপরায়ণ যুবকের হতে পারে, হাসপাতালের কোনো বজ্জাত বয়স্ক লোকেরও হতে পারে। লেখা যারই হোক, উদ্দেশ্য একটাই, তা হ'ল নিপীড়ন। নিপীড়নের কখনো কোনো চরিত্র থাকে না। নিপীড়ন শুধুই একটা পদ্ধতি। এবং যেহেতু এর কোনো চরিত্র থাকে না, পদ্ধতি ক্রমাগত আরো নির্মম, আরো হৃদয়হীন উৎকর্ষের দিকে এগিয়ে যায়। অশোক সেই ভয় এখন করে। সে ভাবে, তার বিরুদ্ধে যে ব্যাপক একটা অসন্তোষ এবং শত্রুতা দানা বেঁধে উঠেছে, এই পদ্ধতির প্রয়োগ সেই বিষয়বস্তুকে লক্ষ্য করে কিনা। ক্রমশ এই সন্দেহটাই তার ভেতরে জোরদার হতে থাকে এবং সে রেগে যায় এই ভেবে যে, তার আর ইরাবতীর নিপীড়নকারী প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ আড়ালে বসে তার পদ্ধতির অমোঘ প্রতিক্রিয়া খুবই উপভোগ করছে।

অন্ধকার রাস্তায় চলতে চলতে অশোক একসময় গতি শ্লথ করে। এই লেখাটা কি এই মুহূর্তেই ধ্বংস করা উচিত নয়? কয়েক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে সে আবার চলতে শুরু করে। সেই আদিম দৈব-নির্ভর পৃথিবীর সময় থেকে, যখন দৈব ও মানুষ উভয়েই প্রত্যক্ষে ছিল, দেয়ালের লেখা এখনো অমোঘ। দেয়ালের লেখা কখনো নিষ্ফল হয় না। যে-কোনো কদর্য মিথ্যাও একবার যদি দেয়ালে লিখে ফেলা যায়, তবে তা ভীষণ শক্তিশালী হয়ে যায়। শক্তিশালী মিথ্যা সত্য

অপেক্ষা অনেক বেশি ক্ষমতাশালী। তাছাড়াও, দেয়ালের লেখা কখনো মোছা যায় না, ঢাকা যায় না, ঘষে উঠিয়ে ফেলা যায় না। উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ আলাদা হলেও ব্রেখটের সেই কবিতাটা বড়ো প্রাসঙ্গিক মনে হয় অশোকের। এক বন্দী জেলখানার দেয়ালে লিখেছিল, 'লেনিন দীর্ঘজীবী হোক'। কর্তৃপক্ষ লেখাটা মুছে ফেলার ব্যবস্থা করে। লেখাটার উপর চুনকাম করা হয়। চুনের রঙ শুকিয়ে উজ্জ্বল হতে নীচের লেখা দ্যুতিময় হয়ে ওঠে। কর্তৃপক্ষ ধারালো কোনো অস্ত্র দিয়ে লেখাটা ঘষে উঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। সাদা চুনকামের পটভূমিতে 'লেনিন দীর্ঘজীবী হোক' খোদাই হয়ে আরো প্রাণবন্ত হয়। শেষে আদেশ হয় দেয়ালটাই ভেঙে ফেলার। এভাবেই সমস্ত দেয়াল ভাঙে কিন্তু 'লেনিন দীর্ঘজীবী হোক' মোছা যায় না। সমস্ত দেয়ালের লেখার একই ভবিতব্য।

কিন্তু ইরাবতী তার কোয়ার্টারে এই ভয়ংকর দেয়াল নিয়ে কী করে থাকবে ? অবশ্য সে প্রকৃত অর্থেই একা নয়। মায়ার মা নামে এক প্রৌঢ়া তার সঙ্গে থাকে। আজকে এই মুহূর্ত থেকে সে ইরাবতীর একাকীত্ব আরো বাড়াবে, সন্দেহ নেই। সে কিছু বুঝবে না, তাকে কিছু বলাও যাবে না, অথচ তার গৃহকর্ত্রীর ভারমুখ তাকে প্রশ্নমুখর করবে।

তারপরেও কাল সকাল হবে। দেয়ালের লেখা থাকবে। অসংখ্য মানুষ দেখবে। তার প্রতিক্রিয়া মানুষের উপর যেমন হয়, তেমনি হবে। তাতে মানুষের দৃষ্টিতে, দৃষ্টিপাতে যে-সব অর্থ, প্রশ্ন, সিদ্ধান্ত, আকার, ইঙ্গিত, শ্লেষ, বিদ্বেষ, প্রতিশোধ সক্রিয় হয়ে উঠবে—তা অমোঘ, অপ্রতিরোধ্য। তারও পরে বিষয়টা আরো গড়াবে। হয়তো —ইরাবতীকে এই জায়গা ছেড়ে এমন-কি চাকরি ছেড়েও চলে যেতে হবে। কেননা এমন সোচ্চার জুগুপ্সা ইরাবতীর মতো সামাজিক অবস্থানের মহিলার পক্ষে হয়তো সহ্য করা সম্ভব হবে না।

আর অশোকের আঘাত এমন এক গোপন জায়গায়, যা সে খুলে

দেখাতে পর্যন্ত পারছে না। সে আঘাত পারস্পরিক কিনা, তাও সে সাহস করে আশা করতে পারে না। একটা অত্যন্ত কোমল এবং নিজের কাছেও যেন আড়াল দিতে হয়, এমন এক গোপনতা সে লালন করছিল। কাউকে জানতে দেয়নি, ইরাবতীকে তো নয়ই, এমন-কি নিজেকেও নয়, নারীসঙ্গে একেবারে অনভ্যস্ত মানুষের যেমন হয়, ছলনা-প্রতারণার ধারকাছ দিয়েও যে যেতে শেখেনি অথচ রমণী যে রক্তে উচ্ছ্বাস তোলে, সেই স্বাভাবিক ঘটনাটা যাকে নিরন্তর মুখচোরা করে রাখে, হঠাৎ হঠাৎ ভীষণ অপরাধীও করে রাখে।

পরদিন অফিসে বসে অশোক এস এ ই পরিমলকে ডেকে পাঠায়। চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর বয়সের পরিমলের চেহারাটা পাকানো। মুখে সবসময়ই পান এবং জর্দার গন্ধ। নিষ্প্রভ ও নার্ভাস চোখের দৃষ্টি তার, কিন্তু মানুষটা সে আদৌ নার্ভাস নয়। সরকারি চাকরিতে তার উন্নতি-অবনতি কতদূর হতে পারে, তা পরিষ্কার তার কাছে। কিছু মানুষ আছে যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—যে-কোনো উপায়ে অর্থোপার্জন এবং এ-কাজে তারা যখন বেশ অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে, তখন আত্মবিশ্বাস ভয়ানক বেড়ে যায়। পরিমল এই ধরনের মানুষ। কাগজ কলম ছাড়া আর কোনো গোপনীয়তা তারা বাহুল্য মনে করে। ফলে নিজের কীর্তিকাহিনী নিজেরাই বেশ ফলিয়ে গল্প করতে ভালোবাসে। এটাই তাদের আত্মপ্রসাদ।

এহেন পরিমল অশোক সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই বিনয়ের কাছে তার মনোভাব প্রকাশ করেছে। আকারে ইঙ্গিতে নতুন বি ডি ও-র সতীপনার কথা নিয়ে সে পরিহাস করেছে। সে বলেছে, ঝড় হচ্ছে—অনবরত আম পড়ছে। তুমি যদি না কুড়োও, চোখ ফেরাবার আগেই দেখবে পাশ থেকে কোনো ছাগল এসে খেয়ে ফেলেছে। তাতে তোমার লাভ?

এই হ'ল পরিমলের জীবনদর্শন। তার সব বোঝা আছে, সবাইকেই

চেনা আছে। কেউ যদি ডালে ডালে চলে, পরিমল নাকি পাতায় পাতায় যাবে।

সেই পরিমল এখন অশোকের সামনে বসে অক্লেশে পান চিবোয়।

অশোক বলে, গতবছর কতগুলো টিউবওয়েল করেছিলেন মনে আছে ?

এই গতবছরটা অশোকের আমল নয়।

পরিমল একটু চিন্তা করে বলে, পঞ্চাশ-ষাটটা হবে।

অশোক বলে, দেখে বলুন, আর এম বি-টা (মেজারমেণ্ট বুক) নিয়ে আসুন। আরো কিছু টিউবওয়েলের টাকা পাওয়া গেছে। কাজটা তাড়াতাড়ি উঠিয়ে ফেলতে হবে।

পরিমলের নার্ভাস মুখে ভাবান্তর ধরা পড়ে না। সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় এবং ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ফেরে না। অশোক পিওনকে দিয়ে আবার তার খোঁজ করে জানতে পারে সে অফিসে নেই।

আসলে পরিমল বড়োবাবুকে গিয়ে যে কথা বলে তাতে অফিসে হাসির হুল্লোড় ওঠে। পরিমল বলে, বিন্দুসারের আমলে কটা টিউবওয়েল হয়েছে, অশোক তা জানতে চাইছে।

তাতে খুব হাসি হয়।

পরে পরিমল বলেছে, এম বি চাইছে, বড়োবাবু।

এটা হাসির কথা নয়। কিন্তু তাতে বড়োবাবু কিংবা পরিমলের কোনো দুশ্চিন্তা হয়নি।

দিনের শেষে অশোক পবিমলকে আবার ডেকে পাঠায়।

—কী ব্যাপার ? এম বি আনতে গিয়ে আপনি যে উধাও হয়ে গেলেন !

— ওইতো হয়েছে মুশকিল। এম বি-টা পাওয়া যাচ্ছে না।

—পাওয়া যাচ্ছে না! তো সেটা আমাকে এসে বলতে হবে না?

—ওটাই তো খুঁজছিলাম।

অশোক জানে কথা বাড়ানোর কোনো অর্থ হয় না। তবুও

বলে, এরকম একটা দরকারি ডকুমেন্ট হারালো কী করে ?

—মানে ঠিক হারায়নি। মানে খুঁজে বের করতে হবে, কোথাও ঢুকে আছে।

—কাল ফার্স্ট আওয়ারে এম বি-টা যাতে খুঁজে পাওয়া যায়, দেখবেন, অ্যাঁ ?

—আচ্ছা।

পরদিন পরিমল মেজারমেন্ট বুক হাজির করে। বইটা উল্টেপাল্টে দেখে অশোক বলে, এই টিউবওয়েলের কনট্রাক্ট কে পেয়েছিল ?

পরিমল বলে, বিপ্লব মল্লিক।

—টিউবওয়েল মাপার সুতোটুতো সব আছে ?

পরিমল এবার একটু সন্ত্রস্ত হয়।

—না, মানে, নেই। করে নিলেই হবে।

—করে নিন। আমি কয়েকটা টিউবওয়েল দেখব।

আগের দিনের দেয়ালের লেখার প্রতিক্রিয়া তার ভেতর থেকে মুছে যায়নি। বরং উত্তরোত্তর তা বাড়ছিল। অশোক ক্রমশ বিরক্ত এবং কী এক তাড়নায় উত্ত্যক্ত হচ্ছিল। সে ইরাবতীর কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছে, ক্ষমা চেয়েছে। এ-সব খুবই আন্তরিক ছিল। এই দুঃখ প্রকাশ কিংবা ক্ষমা চাওয়ায় ইরাবতীর ক্ষত শুকোবার যেমন কোনো কারণ নেই, তেমনি কারণ নেই অশোকের গ্লানি থেকে রেহাই পাওয়ার। এইসব চিন্তা ক্রমশই তাকে রাগী করছিল, করছিল প্রতিশোধপ্রবণ। প্রতিশোধ চরিতার্থ করার লোকজন তার হাতের কাছে অনেক থাকাতে সে কিছুটা বোধহয় হিংস্র হয়ে যায়।

গোটা ছয়েক টিউবওয়েল মেপে দেখার পর সে প্রায় হিসহিসিয়ে ওঠে।

—মেজারমেন্ট বুকে তো আপনারই লেখা, আপনারই সই, না ?

—হ্যাঁ, আমারই লেখা।

—চুরি করার সময় কি একবার চিন্তাও হয় না যে এর জন্য কোনোদিন জবাবদিহি করতে হতে পারে ?

পরিমল অন্য দিকে তাকিয়ে বেশ প্রস্তুত গলায় বলে, এ-সব কথা বলার আপনার কোনো এক্তিয়ার নেই বি ডি ও সাহেব। আপনি আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন, কিন্তু এ-সব কথা বলতে পারেন না।

অশোক বলে, তাই নাকি ? প্রসিডিওর তো আনবই, মুখেও বলব। এম বি-তে একশো চল্লিশ ফুটের টিউবওয়েল লিখেছেন। পেমেণ্ট হয়েছে সেইভাবে। আর সুতো মেপে এই ছ'টার মধ্যে একটাও সত্তর ফুটের বেশি পেলাম না ! আবার বড়ো বড়ো কথা বলছেন ?

পরিমল গলায় শাসানির ভঙ্গি আনে। বলে, বললাম তো, এভাবে কথা বলার এক্তিয়ার আপনার নেই। যা বলবেন, ভালো করে ভেবেচিন্তে বলবেন, নাহলে পরে পস্তাবেন।

অশোক সদম্ভে বলে, তাই নাকি ?

পরিমল বলে, আপনার আগের বি ডি ও-র আমলে এ-সব হয়েছে। তখন কী হয়েছে, কী না হয়েছে, আপনি তার কী জানবেন ? তাছাড়া, টেকনিক্যাল কারণেও বসানো টিউবওয়েলের হাইট কমে যায়। আপনি ও-সব বুঝবেন না।

অশোক দ্রুত দু'পা সামনে এগিয়ে আসে। বলে, বুঝব না ! কী বুঝব না ? টেকনিক্যাল কারণে ছ'মাসের মধ্যে একশো চল্লিশ ফুটের টিউবওয়েল ষাট ফুট হয়ে যায়।

পরিমল দুর্বিনীতের মতো গাড়ির পেছনে উঠে বসে। কথার উত্তর সে দেয় না। তাকে এখন আর মোটেই নার্ভাস দেখাচ্ছে না। অশোকের ইচ্ছা হ'ল টেনে লোকটাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেয় এবং বলে, যারে শালা, হেঁটে বাড়ি যা।

কিন্তু সে ইচ্ছে মনেই চেপে রেখে সে গাড়িতে উঠে বসে এবং বিনয়কে বলে, ফিরে চলুন।

পরদিন সারা অফিসে উত্তেজনা। কোনো টেবিলে কাজকর্মের কোনো লক্ষণ নেই। এখানে ওখানে দলে দলে ভাগ হয়ে সরব গুঞ্জন। মাঝে-মধ্যে উত্তেজিত আস্ফালন, যা অশোকের কাছে অনধীনতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সে ক্রমশ বিষণ্ণ হয়। কেন আমি এরকম একটা পরিবেশে চাকরি করব? কেন আমার চারপাশে শুধু স্বার্থপর মানুষ থাকবে? এমন অসৎ? টেবিলের উপরে পরপর কয়েকটা ফাইল সাজানো। ফাইল উল্টে দেখতে ভয় লাগে তার। কোথায় সই করবে, কীভাবে ফেঁসে যাবে, কে জানে?

গতকালের সমাধান-না-হওয়া বিষয়টা তাকে পীড়িত করে। কাল থেকে অসংখ্যবার চিন্তা করেও একটা প্রশ্নের এখন পর্যন্ত কোনো মীমাংসা-সূত্র সে খুঁজে নিতে পারে নি। তার কি উচিত ইরাবতীর সঙ্গে অবিলম্বে একবার দেখা করা? যে সমস্যার ভ্রূণ একবার জন্ম নিয়েছে, এরকম একটা ছোটো জায়গায় অচিরেই তা বেড়ে উঠবে। দেয়ালের লেখা বাড়তে পারে। হাসপাতালের দেয়াল ছেড়ে লেখা বি ডি ও অফিসের দেয়ালের দিকে ধাওয়া করতে পারে। হয়তো এ-সবের মূল কারণ সে নিজে! তাকে পীড়ন করার উদ্দেশ্যে যে অস্ত্র শানানো হয়েছে, তাতে সম্পূর্ণ সম্পর্ক-রহিত তৃতীয় একপক্ষ সবচেয়ে বেশি আঘাত পেয়ে গেছে। এখন সতর্ক হওয়া দরকার। এই ব্লকে এমন একজন কেউ নেই, যার সঙ্গে সে পরামর্শ করতে পারে। যদিও সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে যে ইরাবতীর সামনে এখন তার মুখ তুলে কথা বলা পর্যন্ত কী অসম্ভব, তবুও এই অবস্থায় ইরাবতী কি আরো বিপর্যস্ত হয়ে যায়নি? এবং সেক্ষেত্রে অশোকের কি উচিত নয় তার পাশে গিয়ে দাঁড়ানো বা তাকে সাহস দেওয়া?

অফিসে কোনো কাজ হচ্ছে না। গুঞ্জন এবং তাকে বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে মাঝে মাঝে চিৎকার চেঁচামেচি সমানে চলছে।

বেলা তিনটে নাগাদ, সারাদিন একরকম নিষ্কর্মা বসে থেকে, অশোক উঠে নিজের ঘরে চলে আসে।

ব্লক অফিস এবং তার থাকার ঘর একই বাড়ির দুই অংশে। পুরোনো, জরাজীর্ণ একটা একতলা বাড়ি। বিগত বর্ষার চিহ্ন বাড়িটার সর্বাঙ্গে। এ হয়তো বর্ষার চিহ্ন নয়। হয়তো, সারা বছরই বাড়িটা এমন থাকে। এইরকম নোনায় ধরা, ভিজে দেয়াল এবং ছাদ। অফিসের ঘরটা এবং বাসার মধ্যে সে কোনো তফাত করতে পারে না। একদল মানুষ আছে যারা অফিস এবং অফিসের বাইরে একেবারেই আলাদা। অফিস তাদের আসল জীবনকে একেবারেই স্পর্শ করতে পারে না। অশোকের মনে হয়, এ একটা অসাধারণ ক্ষমতা। অসাধারণ হলেও তার সহকর্মীদের মধ্যে এরকম কয়েকজনকে সে দেখেছে।

কিন্তু সে তেমন হতে পারবে না কোনোদিন। তার চার বছরের শিক্ষকতার জীবনেও সে স্কুল এবং ছেলেদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল। সেখানকার সুখ-দুঃখ, ক্ষুদ্রতা, হৃদয়হীনতা, লোভ, রাজনীতি সবই তাকে স্পর্শ করত। এখন মনে হয় যেন সেখানেই সে ভালো ছিল।

পাঁচটার পরে বিনয় আসে।

—শরীর খারাপ নাকি স্যার?

শোওয়া অবস্থা থেকে উঠে অশোক বলে, বসুন বিনয়দা। আপনার কথাই ভাবছিলাম।

অশোকের ঘরে শৌখিনতার কোনো বালাই নেই। একপাশে একখানা তক্তপোশের উপর তার বিছানা। মাথার কাছের দেয়ালটা পূর্বদিকের। সেদিকে বারান্দা আছে। ফলে ওই দেয়ালটা শুকনো। সেখানে খবরের কাগজ মোটা করে পেরেক-মারা। অশোক সেখানে তার ধোয়া জামা প্যান্ট হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখে। তক্তপোশের নীচে আছে বড়ো একটা সুটকেস। তার একপাশে তার জুতো রাখার জায়গা। অন্যপাশে মোটামুটি ভাঁজ করে রাখা তার বেডিং। ঘরে

এ ছাড়া আছে একটা না-ছোটো না-বড়ো টেবিল এবং দুটো হাতলওয়ালা চেয়ার। টেবিল দক্ষিণের জানালার সঙ্গে লাগানো। টেবিলের পুবে ও পশ্চিমে চেয়ার দুটো সাজানো। চেয়ার ও টেবিলে ইংরাজি হরফে 'বিডিও' লেখা এবং তার পরে ক্রমিক সংখ্যা। পশ্চিমের চেয়ারের পিছনে দেয়ালে একটা তিন তাকের কুলুঙ্গি। সেখানে কিছু বইপত্র ইত্যাদি আছে। তক্তপোশের পায়ের দিকে অর্থাৎ ঘরের পশ্চিম দিকে ভিতরের ঘরে যাওয়ার দরজা। সেদিকে আরেকটি ঘর, রান্নাঘর, পায়খানা, কল ইত্যাদি আছে। পিছন দিকে বাইরে যাওয়ার একটা দরজাও আছে।

বিনয় পুব দিকের চেয়ারটা টেনে বসে। অশোক যে বিনয়ের কথা ভাবছিল, তা মিথ্যা না। যতবারই তার মনে হয়েছে যে একজন কারুর সঙ্গে কথা বলা দরকার, ততবারই তার বিনয়ের কথা মনে হয়েছে। আবার প্রতিবারে একথাও মনে হয়েছে যে, এরকম একটা ভীষণ ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে বিনয়ের সঙ্গে কী করে কথা বলবে?

অনেকক্ষণ চেষ্টা করে সে শুধু এটুকুই বলতে পারে, একটা ভীষণ ব্যাপার হয়েছে বিনয়দা, বুঝলেন—মানে—এমন একটা ব্যাপার—এমন একটা লজ্জায় পড়ে গেছি আমি—

এর পরে আর সে এগোতে পারে না। ভীষণ অস্বস্তিতে বিব্রত হয়ে আরো দু-একবার মানে—এমন একটা ব্যাপার—মানে—এমন একটা অর্থহীন অসমাপ্ত বাক্যে সে আবার চুপ করে যায়। সে বুঝতে পারে কথাটা বলা তার পক্ষে আদৌ সহজ নয়।

তার মুখ তখন ভীষণ বোকার মতো দেখায় এবং বিনয়ও কিছু বুঝতে না পেরে এবং বুঝতে চেষ্টা ক'রে সম্পর্কের দূরত্ব হেতু সিদ্ধান্তহীন হয়ে যায়। ফলে তার মুখেও একটা নির্বোধ অস্বস্তি।

এ সময়ে বাড়ির ভিতর থেকে বাসন-কোসন নড়াচড়ার আওয়াজ হতে অশোক যেন প্রাণ পায়। সে চেঁচিয়ে ডাকে, মাসি এসেছ নাকি? আমরা একটু চা খাব।

মাসি ঘরে এসে জিজ্ঞেস করে, কিছু খাবে না? ডিমের ওমলেট করে দেব?

ইরাবতীর যেমন মায়ার মা, অশোকের তেমনি মাসি।

অশোক বলে, ডিম আছে? ওঃ ফাইন! বেশ বড়ো করে ওমলেট বানাও তো।

মাসি চলে যেতে আবার সেই অস্বস্তি ফিরে আসে। দু'খানা হাত এবং দু'খানা পা ভারি অবান্তর হয়ে যায়। যেমন মঞ্চে উঠলে নতুন অভিনেতার হয়। সে পুব দিক থেকে বালিশটা তুলে এনে পশ্চিম দিকে রাখে এবং নিজেও উল্টে যায়। নাঃ, তাতেও স্বস্তি নেই। বিনয় জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। এ ছাড়া তার আর কীই-বা করার আছে?

অশোক আবার ওঠে, সিগারেট ধরায়, খাট থেকে নেমে সিগারেটের প্যাকেট বিনয়ের সামনে ধরে।

বিনয় সিগারেট নেয়। না নিলে অশোক পীড়াপীড়ি করে। তবে অন্য লোকের সামনে নেয় না।

বিনয় বলে, ক'দিন ছুটি চাইব ভেবেছিলাম স্যার, কিন্তু অফিসের যা অবস্থা তাতে ভরসাও পাচ্ছি না।

অশোক বলে, কেন? আপনার ছুটির সঙ্গে অফিসের ঝামেলার কী সম্পর্ক?

বিনয় বলে, হঠাৎ আপনার গাড়ি দরকার হতে পারে স্যার। অফিস স্টাফ হয়তো কিছু গোলমাল করবে। আপনাকে হয়তো সদরে যেতে হতে পারে।

—আমাকে যদি সদরে যেতেই হয়, আমি বাসে যাব। তা বলে তো আর আপনার প্রয়োজন আটকে থাকতে পারে না। আপনার ছুটি দরকার ক'দিনের?

—দিন তিনেকের। কিন্তু আপনি বোধহয় খুব অসুবিধায় পড়বেন স্যার।

—আরে সে ভাবতে হবে না! দিন তিনেকের তো ব্যাপার।

—দরকারটা খুব জরুরি, না হলে এ সময় যেতাম না। আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। মাথা গরম করবেন না স্যার। অফিস স্টাফ হয়তো আপনার কাছে ডেপুটেশন দেবে।

—ডেপুটেশন? কিসের জন্য?

—কিছুর জন্য তো আজকাল আর দরকার হয় না। উদ্দেশ্য আপনাকে একটু ভয় দেখানো।

অশোক একটু হাসে। বলে, সে দিক। গণতান্ত্রিক অধিকার সবারই আছে, শুধু আমার ছাড়া। ও আমি সামলে নেব, আপনি ভাববেন না।

মাসি চা আর ওমলেট দিয়ে যায়। ওমলেট খেয়ে চা খেতে খেতে বিনয় একটু দ্বিধা নিয়ে বলে, কী একটা বলতে চাইছিলেন স্যার? বলতে গিয়ে থেমে গেলেন?

অশোক এতক্ষণে খানিকটা ধাতস্থ। বলে—হ্যাঁ, কাল একটা অত্যন্ত লজ্জার ঘটনা ঘটেছে। সেই কথাটাই বলতে চাইছিলাম।

যতটা সম্ভব সহজভাবে কথাটা বলার চেষ্টা করে সে। তা সত্ত্বেও বার বার তার চোখমুখ আরক্তিম হয়।

বিনয় মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শোনে। ভীষণ দ্বিধায় পড়ে সে। অশোক তার উপরওয়ালা, তার উপরে বয়সে অনেক ছোটো। এরকম একটা সমস্যায় সে কি উপদেশ দিতে পারে? অশোক অথচ তারই পরামর্শ চেয়েছে।

কথাগুলো বলে ফেলে অশোক অস্বস্তিতে ঘন ঘন সিগারেটে টান দিতে থাকে। কেউ কারো মুখের দিকে তাকায় না।

শেষে বিনয় বলে, এ-সব ব্যাপারে দু'রকম পরামর্শ হতে পারে স্যার। এক হ'ল, এ ব্যাপারটা আর বাড়তে না দেওয়া, এমন কিছু না করা যাতে লোকের চোখে লাগে।

বস্তুত, অশোক এই পন্থাই নিয়ে বসে আছে মনে মনে। সব থেকে

নিরাপদ, সবচেয়ে অন্তরাল। (সঙ্গে সঙ্গে উৎপীড়কদের কাছে প্রায় হাঁটু গেড়ে বসে পড়া নয় কি ? যেন এই করুণা ভিক্ষা, দেখো তো, আমি তো কিছু করছি না আর, তবে আর আমাকে কেন—। এ দিকটা বিনয়ের দ্বিতীয় পরামর্শের আগে অবশ্য তার মাথায় ধরা পড়েনি। আশ্চর্য! এরকম একটা ভীরু কাঙালপনা তার ভিতরে অবচেতনে বসে আছে !)

বিনয় বলে, আর দ্বিতীয় পরামর্শ হচ্ছে স্যার, এ-সব কোনো কিছুকে তোয়াক্কা না করে, আপনি যেমনভাবে চলছিলেন, তেমনভাবেই চলবেন। অন্যায় তো কিছু করছেন না।

তাই তো ! আমি তো অন্যায় কিছু করছি না। তবে আর এমন ভীরু পলায়নী মনোবৃত্তি কেন হবে আমার ? আমি কেন মেনে নেব ? কেন আড়ালে থাকব ?

অশোক বলে, আমি নাহয় চ্যালেঞ্জ নিলাম, কিন্তু ওই মহিলা ? ডক্টর মিস সেন ?

বিনয় বলে, ওনার ব্যাপারটাই আগে বোঝা দরকার স্যার। আপনি আগে ওনার সঙ্গে কথা বলুন।

এটুকুই দরকার ছিল অশোকের। অন্তত, একজন মানুষের নৈতিক সমর্থন। বিনয় সেটুকু করেছে। সে খুশি হয়, সাহস পায়। ছুটির দরখাস্ত দিয়ে বিনয় চলে যায়। যাওয়ার আগে আরেকটা কথা সে বলে।

বিনয় বলে, আপনি হয়তো অযথাই এত ভাবছেন স্যার। আসলে হয়তো পথচলতি কোনো লোক আপনাকে ওখানে দেখে ওরকম একটা বজ্জাতি করে গেছে।

সন্ধ্যার বেশ-কিছু পরে অশোক ইরাবতীর কোয়ার্টারে যায়। কোয়ার্টারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেয়ালটার দিকে ভালো করে তাকায় সে। সেই ভুলটা করা হয়েছে। এবং সম্ভবত ইরাবতীই করিয়েছে। লেখাটা কিছু দিয়ে মোছার চেষ্টা হয়েছে—মনে হয়, জল-ন্যাকড়া

দিয়ে। ফলে লেখাটা একটু মলিন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু জায়গাটা হয়েছে অনেক বেশি প্রকট।

দরজা খোলে ইরাবতী এবং প্রথমবারের পর দ্বিতীয়বারে আর অশোকের চোখে চোখ রাখে না। অশোক সাহসী হওয়ার চেষ্টা করে। এবং ইরাবতীর কৃশ 'আসুন'-এর উত্তরে নিজের বেশ সপ্রতিভ 'কী ব্যাপার, অসময়ে ঘুমোচ্ছিলেন নাকি?' নিজের কানেই স্থূল লাগে। ইরাবতীর চোখ-মুখের আবেগস্ফীতি এখনো আছে। এখানে এসে কীভাবে কথাটা তুলবে, কী কী আলোচনা করবে, এবং ইরাবতীকে কীভাবে সাহসী করবে, এ-সব সে সবিস্তারে চিন্তা করে এসেছিল। কিন্তু ইরাবতী 'বসুন' বলার পর চেয়ারে বসতে যতটুকু সময় লাগে তার মধ্যেই অশোকের পুরো প্রস্তুতিটা নষ্ট হয়ে যায়।

ইরাবতীর মুখচোখের চেহারা উদ্‌বেগের। তার কালকের কান্নাটা বোধহয় বেশ-কিছু সময়ের জন্য স্থায়ী ছিল এবং বাকি সময়ও নিশ্চয়ই সে বিছানায় মুখ গুঁজে কাটিয়েছে। সে মায়ার মাকে ডেকে দু'কাপ চা করতে বলে।

এ ঘরটা তার বসার ঘর। একটা লোহার খাট, যেগুলো হাসপাতালে বেড হিসাবে ব্যবহার হয়, একদিকে। আসবাবের মধ্যে এছাড়া আছে তিনখানা চেয়ার ও একটা ছোটো টেবিল। ইরাবতী প্র্যাকটিস করা ডাক্তার নয়। তবুও ডাক্তার হলে বাড়িতে কখনো কখনো রোগী দেখতেই হয়। এ ঘরটা সে কারণেও ব্যবহৃত হয়। একপাশে একটা তাকের উপর কিছু ওষুধপত্রের শিশি-বোতল এবং ট্যাবলেটের রুপালী পাতা। দেয়ালে পেরেকের সঙ্গে ঝোলানো ইরাবতীর স্টেথোস্কোপ।

চা দিতে ব'লে, ইরাবতী, খুব একটা আবশ্যক নয়—এমন ভঙ্গিতে ঘরের জিনিসপত্র গোছগাছ করে। সুইচ টিপে টিউব লাইটটা জ্বালাবার চেষ্টা করে ক্ষান্ত হয়। ভোল্টেজ খুবই কম। একটা একশো ওয়াটের বাল্‌ব ঘরে জ্বলছে। শেষ পর্যন্ত সে ফ্যানের সুইচ

অন করে। অশোকের মনে হয়, ইরাবতীর এই একটা কাজই শুধু কিছু করার জন্য নয়।

এর পর অগত্যা ইরাবতী খাটের একপাশে বসে এবং অশোকের মুখের দিকে তাকায়। ইরাবতীর চোখ কতখানি আয়ত এবং দৃষ্টি কতখানি গভীর তা সে পুরোপুরি কারো দিকে না তাকালে বোঝার কোনো উপায় নেই। চোখ ও ভুরুর মধ্যকার উপত্যকা প্রশস্ত হওয়ায় তার ভ্রূ-ভঙ্গিতে অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিত্ব এসেছে। এই বৈশিষ্ট্য অনভিপ্রেত মানুষের জন্য একটা সম্ভ্রমপূর্ণ দূরত্ব রচনা করে।

ইরাবতী সোজাসুজি তাকাতে অশোক অস্বস্তিতে চোখ সরিয়ে নেয়। সে কি ভুল করল? পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সে একটা সিগারেট ধরায়। সিগারেট ধরিয়ে দরজার বাইরে দৃষ্টি রেখে সে ধূমপান করতে থাকে। পরিস্থিতির উপরে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে সে অপেক্ষা করে। ইরাবতীর পূর্ণ দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে নতুন একটা ভয়ের ভাবনা তাকে পীড়িত করে, যে ভাবনা গতকালের ঘটনার পর থেকে একবারও তার মনে উদয় হয়নি। সে কি অনভিপ্রেত হয়ে গেছে ইরাবতীর কাছে? এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘামতে শুরু করে। না তাকিয়েও সে অনুভব করে ইরাবতীর সন্ত্রাস্ত আয়ত চোখ তার মুখ জরিপ করছে।

সামান্য সময়, কিন্তু তাই অনন্ত মনে হয় সন্দিহান অস্বস্তিতে। সে বেপরোয়া মুখ ফেরায় এবং কয়েক মুহূর্তের জন্য ইরাবতীর দৃষ্টিকে প্রতিহত করে। বৃষ্টিতে ভেজা নতুন পাতার মতো ইরাবতীর ভারী চোখদুটি নত হয়। অশোক অত্যন্ত গভীর এবং বিস্মিত আফসোসে বলে, আমি—আপনাকে বিরক্ত করছি না তো, ডক্টর মিস সেন?

ইরাবতী চকিতে একবার চোখ তুলে ফের নামিয়ে নেয়। একটু পরে সে তার নতমুখ খুব ধীরে ধীরে চারবার এদিকে ওদিকে নাড়ে। তার নাতিদীর্ঘ চুল বাঁদিকের কাঁধ উপচে বুকের উপরে দোলে। অশোক অদম্য সাহস পায়। বলে, কালকের ঘটনাটা নিয়ে আপনার

সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন, তাই অনেক দ্বিধা সত্ত্বেও আমি এসেছি। কাল থেকেই নিজেকে ভারি অপরাধী মনে হচ্ছে, ডক্টর মিস সেন। তাই—

ইরাবতী বলে, অশোকবাবু, আমার নাম ইরাবতী।

ইরাবতী কথাটা এত আস্তে বলে যে, চা দিতে এই সময় মায়ার মা ঘরে ঢোকাতে অশোকের মনোযোগ সামান্য বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং সে নিজের কানকে সন্দেহ করতে থাকে।

বিনয় যেমন আশঙ্কা করেছিল, পরদিন অফিসে কিন্তু তেমন কিছু হয় না। তবে দুপুরে অনাদি আসে তার তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে। সভাপতির ঘরে না গিয়ে তারা সরাসরি অশোকের ঘরেই আসে।

অশোক তাদের অভ্যর্থনা করে।

—আসুন, বসুন।

অনাদি বলে, বসতে আসিনি বি ডি ও সাহেব। কিছু দরকারি কথা আলোচনা করতে এসেছি। তারা চারজনেই বসে এবং অনাদি তার স্বভাব অনুযায়ী কৌশল বা শিষ্টাচারের তোয়াক্কা না করে সরাসরি প্রসঙ্গে চলে আসে। রাজনীতি করা বহু মানুষের এটা একটা বিশেষ লক্ষণ।

অনাদি বলে, গত দু'মাসে পঞ্চায়েতের কোনো মিটিং দেননি, ফলে উন্নয়নের সব কাজকর্ম বন্ধ। টাকা এসে পড়ে রয়েছে, অথচ কাজ হচ্ছে না। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোও টাকা পাচ্ছে না। আবার শুনলাম, গতবছর যে-সব কাজকর্ম হয়েছে, তার মধ্যেও নাকি কী সব ত্রুটি খুঁজে বের করে অফিস স্টাফের সঙ্গে বিরোধ বাধিয়েছেন?

এক নিশ্বাসে এতগুলো কথা বলে অনাদি একটু থামে এবং সঙ্গী তিনজনের মুখের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়।

অশোকের ডানপাশে বসেছে তড়িৎ মিত্র। লম্বা-চওড়া চেহারার পঞ্চাশের সামান্য এদিক-ওদিক বয়সের এই লোকটি অনাদির পার্টি

জেলা কমিটির একজন সদস্য। পার্টির বাইরেও একজন শক্ত লোক বলে পরিচিত। তড়িৎ ধুতি এবং লম্বা হাতার শার্ট পরে। শার্টের হাতা কনুইয়ের উপর পর্যন্ত গোটানো থাকে সব সময়। ভারী মুখ, গম্ভীর এই লোকটির গলার স্বরও অসম্ভব ভারী। তড়িতের সঙ্গে এর আগেও অশোকের সাক্ষাৎ হয়েছে। তড়িৎ সেই পর্যায়ের দাম্ভিক মানুষ, যারা কথাবার্তা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রতিপক্ষকে বুঝিয়ে দেবে যে, বিষয়বস্তু যাই হোক-না কেন, প্রতিটি সংলাপ এবং প্রতিসংলাপ সম্পূর্ণ ই তার ইচ্ছানুযায়ী পূর্ব-নির্ধারিত এবং যে-কোনো বাস্তব বিষয়ের উপর তার বিশ্লেষণের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ অমোঘ। এই ধরনের মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জেতে। কিন্তু যদি কখনো হারে, তাহলে মুহূর্তেই ভীষণ হয়ে যায়। তড়িৎ বসা থেকেই তাকে স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। অশোক জানে তড়িতের এও এক কৌশল।

অনাদির বাঁ পাশে অনন্ত। এ লোকটিও তড়িতের সমবয়স্ক। ধুতি ও টেরিকটনের সাদা পাঞ্জাবি তার সব সময়ের পোশাক। সাধারণ চেহারার অনন্ত যে-কোনো অবস্থায় ভালো মধ্যস্থতার কাজ করতে পারে। বার-দুয়েকের অভিজ্ঞতায় অশোক এরকমই বুঝেছে।

অনন্তর বাঁদিকে বসেছে সমীর। তিরিশের মধ্যে তার বয়স। শার্ট ও প্যান্ট পরা সমীর একজন অঞ্চল প্রধান। প্রধান হবার পরে নিজেকে সে ভারি বিজ্ঞ এবং খুব দায়িত্বশীল নেতা ভাবতে শুরু করেছে।

অনাদির কথার উত্তরে অশোক বলে, মিটিং-এর তারিখ গতমাসেও এবং এ মাসেও আপনার কাছে জানতে চেয়েছিলাম। গতমাসে আপনি ব্যস্ততার জন্য তারিখ দিতে পারেননি, আর এ মাসে বলেছিলেন পরে জানাবেন। কিন্তু এখনো জানাননি। তা এ দোষটা কি আমার ? আর অফিস স্টাফের ভুলত্রুটি দেখাটা তো আমার প্রশাসনিক কাজ, এটাকে বিরোধ বলছেন কেন ?

অশোক বোঝে অনাদি আজ একটা-কিছু ঘটাবার জন্য সদলবলে

তৈরি হয়ে এসেছে। কয়েকদিন আগে তাদের ডবলিউ বি সি এস সংগঠনের একটা সার্কুলার এসেছে। তাতে পঁচিশ-ত্রিশ জন বি ডি ও-র পঞ্চায়েত এবং পার্টির হাতে নিগৃহীত হবার খবর আছে। যে-কোনো বি ডি ও-র মতো সেও না ভেবে পারে না যে, পরবর্তী লক্ষ্য সেই কিনা!

অন্যরা এখনো চুপ করে থাকে এবং তাকে দেখে। অনাদিই আবার বলে, আমি দিন দিতে পারিনি মানে কি এই যে আপনি মিটিং দেবেন না? মিটিং ডাকা তো আপনার কাজ।

—চমৎকার! আমার কাজ বটে, তবে আপনার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, সভাপতি সাহেব। আপনি আজই বলুন-না, কবে মিটিং দেব?

পানজোড়া ব্লকের ছ'টি গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনটিতে অনাদির দলের আধিপত্য, দুটি এবারে বে-হাত এবং আপাতত বিষকাঁটা, একটিতে অনাদিদের সহযাত্রী অন্য একটি দলের প্রাধান্য। সুতরাং কোনো বিশেষ ব্যাপারে সব দিক সামলে না নিয়ে মিটিং দিতে অনাদির আপত্তি। মিটিং-এ এবারে আর সহজে কিছু নিষ্পত্তি হয় না। গণ্ডগোল হয়, প্রতিপক্ষ অনেক সময়ই আইনের সুযোগ পেয়ে যায়।

সমীর আচমকা বলে, আচ্ছা বি ডি ও সাহেব, বামনীর খাঁড়ির উপরে ···দাকে যে একটা রেডিওগ্রাম করতে বলেছিলাম, করেছেন? সে একজন মন্ত্রীর নামের পরে '···দা' শব্দটা ব্যবহার করে।

অশোক বলে, না। আমি ডি এম-কে এ সম্বন্ধে লিখেছি।

—কেন? রেডিওগ্রাম করলেন না কেন?

—কোনো মিনিস্টারকে ওইভাবে রেডিওগ্রাম করার ক্ষমতা আমার নেই। আর যে-কোনো ব্যাপারে রেডিওগ্রাম করা যায় না, তাতে রেডিওগ্রামের গুরুত্ব কমে যায়। একথা তো সেদিনই আপনাকে বলেছিলাম।

—বাঁধের ব্যাপারটা যে-কোনো ব্যাপার হয়ে গেল? এরকম একটা ডেঞ্জারাস ব্যাপারে আপনার কাছে কোনো গুরুত্ব নেই! আশ্চর্য!

সমীর তার বক্তব্যের সমর্থন খোঁজে সঙ্গীদের মুখের দিকে বিস্ময় ছুঁড়ে দিয়ে।

—বাঁধটা তো আমি দেখেছি। সারানো দরকার ঠিকই। কিন্তু এই মুহূর্তেই রেডিওগ্রাম করার মতো গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি।

—বাঃ চমৎকার! এরকম একখানা বি ডি ও থাকলেই ব্লকের ডেভেলপমেণ্ট হয়েছে!

অশোকের খেয়াল হয় পশ্চিমবাংলায় এমন ব্লকও আছে, যেখানে পঞ্চায়েত সমিতি বি ডি ও-কে প্রত্যাহার করে নেবার জন্য সিদ্ধান্ত পাস করিয়েছে এবং তাতে বেশ-একটা প্রশাসনিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তবুও সে সমীরের অপমানজনক উক্তি হজম করতে পারে না। সে সশ্লেষে বলে, কী আর করবেন, আপনাদের মন্দ কপাল!

এতে পরিস্থিতি আরো গুরুতর আকার ধারণ করে। সমীর উত্তেজিত ফণা তুলবার আগেই অনন্ত বলে, আহা সমীর, আগে কাজের কথাগুলো হতে দাও। তারপরে ও-সব দেখা যাবে।

সমীর বলে, বাঁধের কথাটা কাজের কথা নয়? ওই বাঁধ নিয়ে যা পলিটিক্স শুরু হয়েছে, তাতে যে-কোনোদিন আমি খুন হয়ে যেতে পারি!

যেন এতক্ষণের কথাবার্তার সঙ্গে কোনোই সম্পর্ক নেই এবং এগুলো যেন সে শোনেইনি বা প্রয়োজন মনে করেনি শুনতে, এভাবে তড়িৎ তারপর কথা বলতে শুরু করে। তার গম্ভীর গলায় সে যথাসম্ভব দার্ঢ্য আনে এই কারণে, যাতে অন্যরা তাকে সমীহ করে এবং গুরুত্ব দেয়। সে বলে, বি ডি ও সাহেব, আপনাদের বিরোধ আপনারা পরে মিটিয়ে নেবেন, কিন্তু আমি এসেছি বিশেষ প্রয়োজনে। মন দিয়ে শুনুন।

কথা বলতে বলতে তড়িৎ পকেট থেকে এক প্যাকেট বড়ো মাপের দামী সিগারেট বের করেছে। একটা সিগারেট ঠোঁটে চেপে সে

অন্য পকেট হাতড়ে একটা খুবই মূল্যবান গ্যাসলাইটার বের করে। সে সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ে, সিগারেটটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে অকারণ এবং এভাবে অন্য সবাইকে চুপ করিয়ে নিজের মুখাপেক্ষী করে রাখে। তারপর আরো একবার সিগারেটে টান দিয়ে সে বলে, হ্যাঁ — যা বলছিলাম। আপনার ব্লকের ডেভেলপমেন্টের কাজ আদৌ আশাব্যঞ্জক নয়, এ কথা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল কন্‌সালটেটিভ কমিটির মিটিংয়েও আলোচনা হয়েছে। অন্যান্য ব্লক আই আর ডি পি, আই টি ডি পি, এস এ পি এবং অন্যান্য স্কিমে অনেক এগিয়ে আছে। পঞ্চায়েত সমিতি সরাসরি যে-সব উন্নয়নের কাজ করে, তাতেও পানজোড়া ব্লক সব থেকে পিছিয়ে। আমাদের জেলাস্তরেও এ নিয়ে সমালোচনা হয়েছে এবং যেহেতু এখানকার পঞ্চায়েত সমিতি আমাদের দখলে, কাজেই সমালোচনা আমাদের শুনতেই হচ্ছে। আরো একটা অত্যন্ত জরুরি বিষয় আপনাকে জানিয়ে রাখি, অবশ্য আপনার জানাই আছে যে লোকসভার নির্বাচন খুব শিগগিরি হবে। কাজেই এই ব্লকের ভোট যদি আমাদের বিপক্ষে যায় তবে সেক্ষেত্রে বিফলতার জন্য কিন্তু আপনার দায়িত্বও এড়াতে পারবেন না। এ কথাগুলো আপনাকে পরিষ্কার করে বলাই ভালো।

অশোক বলে, এই ব্লকে আমি এসেছি মাত্র মাস চারেক হ'ল। কাজেই ব্লক পিছিয়ে থাকার সব দায়-দায়িত্ব কীভাবে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন বুঝতে পারছি না।

তড়িৎ যেন জানে অশোকের প্রতিক্রিয়া কী হবে, তড়িৎ যেন জানে অশোক কী যুক্তি দেখাবে। কাজেই অশোকের কথা শেষ হবার আগেই সে তার তৈরি কথা শুরু করে। সে বলে, দেখুন বি ডি ও সাহেব, দায়-দায়িত্ব ঠিক ওইভাবে আপনাদের প্রশাসন দেখে না। ঠিক কিনা? দায়-দায়িত্ব সরকারের, ব্লক স্তরে ব্লকের অফিসারের। কাজেই আগে কী হয়েছে, পরে কী হবে, এ-সব খুবই কু-যুক্তি। আসল কথাটা হল ক্রেডিট প্ল্যান এবং ব্লকের উন্নয়ন, এই দুটো

ব্যাপারে কাজ কতদূর হ'ল, তার মূল্যায়ন করা। আমি এ নিয়ে ডি এম-এর সঙ্গেও আলোচনা করেছি। পানজোড়া ব্লক নিয়ে ডি এম-ও খুব অ্যানয়েড্।

তড়িৎ খুবই ক্ষমতাশালী মানুষ। পার্টি এবং জেলা-প্রশাসনের মধ্যে যোগসূত্র সে-ই রক্ষা করে এবং সে দায়িত্বও তার। জেলাশাসক তাকে খাতির করে। ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষায় দীর্ঘদিন অপেক্ষা ক'রে থাকার সময় আশা নিরাশা সমানভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। তারপর আচমকা ক্ষমতা হাতে চলে এলে সেই ক্ষমতা দেখাবার একটা প্রবণতা জোরদার হয়ে ওঠে। সুতরাং অশোক কী যুক্তি দেখাচ্ছে, তা নিয়ে তড়িতের মাথাব্যথা নেই। সে এক কথায় অশোকের যাবতীয় বক্তব্যকে কু-যুক্তি আখ্যা দিতে পারে এবং নাও শুনতে পারে।

এবার সে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে একটা ডায়েরি বের করে। বলে, আমাকে একটা মোটামুটি হিসাব দিন তো।

সে ডট্পেন নিয়ে প্রস্তুত হয়।

—আপনার ব্লকে আপনি আসার পর কতগুলো ক্রেডিট ক্যাম্প হয়েছে ?

অশোক বলে, একটাও না।

তড়িৎ খুব আশ্চর্য হওয়ার ভাব দেখিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আরেকটা সিগারেট ধরায়। বলে, সেকি ? এখন অক্টোবর মাস। ফিন্যানসিয়াল ইয়ারের আদ্ধেকের বেশি চলে গেছে। কাজ ওঠাবেন কী করে ?

অশোক বলে, আমি আসার আগে যে-কটা ক্রেডিট ক্যাম্প হয়েছিল, তাতে প্রায় পাঁচশো লোককে বাছাই করা হয়েছে। সে-সব লোক এখনো ব্যাঙ্ক থেকে লোন পায়নি। কাজেই নতুন করে ক্রেডিট ক্যাম্প করতে গ্রাম পঞ্চায়েতই রাজি হচ্ছে না। আমারও খুব একটা ইচ্ছে নেই।

তড়িৎ বলে, কেন ? লাস্ট ডি এল সি সি-তে তো আপনি ছিলেন ? সেখানে ডি এম তো স্পষ্টই বলে দিয়েছেন যে আপনারা আপনাদের

টারগেট কমপ্লিট করে দেবেন, তারপর ব্যাঙ্ক যদি টাকা না দেয়, সে ব্যবস্থা ডি এম করবেন।

জেলাশাসক এমন কথা বলেছিল বটে। আবেগে এবং কিসের তাড়নায় কে জানে, হঠাৎ পঞ্চায়েত সভাপতিদের বলে ফেলেছে, ব্যাঙ্ক টাকা না দিলে আপনারা ঘেরাও করছেন না কেন? ঘেরাও করে ম্যানেজারদের বাধ্য করুন টাকা দিতে। আমি পুলিশ পাঠাব না।

ব্যাঙ্ক অবশ্যই কিছু সমস্যার কথা তুলেছে। ক্রেডিট ক্যাম্প মানে একটা বিশৃঙ্খল বাজার। শয়ে শয়ে মানুষ কিছু একটা পাবে এই আশায় এসে হাজির হয়। তাদের অর্ধেকের মতো আগেই কোনো-না-কোনো ভাবে ব্যাঙ্ক, সমবায় সমিতি ইত্যাদি থেকে ঋণ নিয়ে বসে আছে। হয় সে ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা তাদের নেই, নয়তো স্বেচ্ছায় তারা তা পরিশোধ করবে না। এই হল এক দিক।

তা ছাড়া ব্যাঙ্কের নিয়মকানুন কমতে কমতে এখন একেবারে প্রান্তিক সীমায়। সেটুকুও মানার প্রয়োজন কেউ বোধ করে না। এর উপরে আছে সরকারি বিশেষজ্ঞদের তৈরি নানারকম অদ্ভুত কল্পনাপূর্ণ প্রকল্প। এ-সব প্রকল্পের মাথামুণ্ডু, লাভ-ক্ষতি বুঝতে যাওয়ার চেষ্টা বৃথা। কোনোরকমে এইসব কাগজপত্র (যা বহু সময়েই অসম্পূর্ণ) ব্যাঙ্কে পাঠাতে পারলেই হ'ল। তারপর বিভিন্নভাবে চাপ দেওয়া, ভীতি প্রদর্শন, ব্যাঙ্কে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, অশালীন কথাবার্তা বলা, এমন-কি কখনো কখনো শারীরিক নির্যাতন।

এ-সব হ'ল সংক্ষেপে ব্যাঙ্কের বক্তব্য। অশোকের ব্লকে দুটি ব্যাঙ্ক আছে। তাদের ম্যানেজার কয়েকদিন আগে তার সঙ্গে দেখা করে এ-সব কথা বলে গেছে। উপরন্তু জেলাশাসক নিজেই ঘেরাও-য়ে উৎসাহ দেবার ফলে এরা বেশ শঙ্কিত। তারা বলেছে, লোন স্যাংশন করে রেখেছি, এবার ডিসবার্সমেন্টের ব্যবস্থা করুন। কয়েকশো গোরু মোষ, ছাগল, শুয়োর, হাঁস, মুরগি কিনতে হবে। আপনার মেশিনারি দিয়ে কিনে দিন। অনেকগুলো স্কিম আছে ছোটো ব্যাবসার। এদের

অধিকাংশেরই কোনো দোকান নেই, অনেকেই হাতে টাকা দিলে গুনতে পর্যন্ত পারে না। বলে দিন, কীভাবে এদের দাদন করব? সরাসরি টাকা দেওয়াতে ব্যাঙ্কের আপত্তি আছে ঠিকই, কিন্তু ডি আর ডি এ-র আপত্তি আরো বেশি। আপনার মেশিনারি কোথায়? ডি এল সি সি-তে কতরকম সাবকমিটি তৈরি হল, ডি এম সব মুশকিল আসান করে দিলেন, কোথায় সে-সব?

দুই ম্যানেজারের একজন বলে, শুনুন বি ডি ও সাহেব, টাকা তো আমরাই দিই। কাজেই মানুষের উপরে আমাদেরও কনট্রোল কিছু থাকবেই। সেটা নিশ্চয়ই মানবেন। এখন মার যদি আমরা খাই, তবে আপনিও যাতে তার কিছু ভাগ পান, সে ব্যবস্থা করতে পারব, সে বিশ্বাস আছে। একটা কথা মনে রাখবেন, টাকাটা আমার হাত দিয়েই লোকের হাতে যায়।

অশোক একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিল। বলেছে, এভাবে কেন বলছেন?

ম্যানেজার বলেছে, বলছি এ কারণে যে, জেলা-প্রশাসনের কর্তা নিজেই ঘেরাওয়ের পলিটিক্যাল স্লোগান দিচ্ছেন। কেন এত উৎসাহ? চাকরি, চাকরি। কাজেই চাকরি যখন আমাদেরও করতে হবে, নিজেদের চামড়া বাঁচাবার চেষ্টাও তো করব। আপনারা তো কোনো-রকমে কাগজ পাঠিয়ে খালাস, তারপর মরুক ব্যাটা ম্যানেজার।

প্রশাসনের বাঁধা কথাগুলো অশোককে বলতেই হয়। ছক বাঁধা, স্তোক দেওয়ার জন্য কতগুলো মিথ্যা কথা বলতে তার ঘেন্না লাগে, তবুও। রাজ্যস্তরে মন্ত্রীসভা, জেলাস্তরে জেলাশাসকরা এবং ব্লকস্তরে বি ডি ও-রা এক বিচিত্র প্রতিযোগিতায় ভোগে। প্রতি ব্লকে বছরে অন্তত ছ'শো পরিবারকে দারিদ্র্যসীমার উপরে তুলতে হবে, এই হ'ল লক্ষ্যমাত্রা। কোনো ব্লক দেড় হাজার, কোনো ব্লক আড়াই হাজার তাদের লক্ষ্য পূরণ করে রেখেছে। অর্থাৎ এই পরিমাণ দরিদ্র মানুষের কাগজপত্র ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে বসে আছে। কোনো জেলাশাসক করেছে চল্লিশ হাজার, ক'রে খুব আত্মপ্রসাদে ছিল। হঠাৎ খবর

আসে পাশের জেলায় পঞ্চাশ হাজার হয়ে গেছে। আবার তোড়জোড়, আবার কাগজ তৈরি করা। ডি আর ডি এ মৎস্যচাষ দপ্তর, আদিবাসী দপ্তর, তুঁতচাষ দপ্তর কোটি কোটি টাকা ভরতুকি হিসাবে ব্যাঙ্কের শাখায় শাখায় পাঠিয়ে নিজেরা খালাস হচ্ছে। ব্যাঙ্ক তখন পুরো বিষয়টাকে নিজের কায়দায় লেজে খেলাচ্ছে। ভরতুকির টাকা একই সময়ে দীর্ঘদিন যাবৎ নানা কায়দায় ঋণ এবং আমানত হিসাবে তাদের হিসাবের খাতায় শোভা পাচ্ছে। তাতে উপরওয়ালার কাছে ম্যানেজারদের বুদ্ধিমত্তা ও উপযুক্ততা প্রমাণ হচ্ছে। এতে আখেরে লাভ হয়। আর সব থেকে বড়ো কথা, কি সরকারি কি বেসরকারি, সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত এই টাকা একটা বিশাল সুবিধাভোগী শ্রেণীকে লাভবান করছে।

এই হচ্ছে সার্বিক গ্রামোন্নয়ন। এইভাবে লক্ষ লক্ষ পরিবার পরিসংখ্যানে স্বয়ম্ভর হচ্ছে, দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠছে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে এইভাবে স্বয়ম্ভর করার পৃথক পৃথক পরিকল্পনার অলীক বিন্যাস অশোক আরো অনেকের মতোই মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারে না। তার আক্ষেপ আরো অনেকের মতোই 'হায় চাকরি' 'হায় অন্নদাস' স্তর পর্যন্তই থাকে।

অভিজ্ঞতায় সে বুঝেছে, এ সম্পর্কে যুক্তি দেখাতে যাওয়া কী পরিমাণ মূঢ়তা! কাজেই তড়িতের কথার উত্তরেও সে চুপ করে থাকে।

তড়িৎ পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নেয়, কোন্ স্তরে কত কাজ বকেয়া পড়ে আছে, সেগুলোকে কীভাবে কায়দা করতে হবে, নতুন ক্রেডিট ক্যাম্প কোথায় কোথায় করতে হবে, ব্যাঙ্কের উপর কীভাবে চাপ সৃষ্টি করতে হবে ইত্যাদি।

তারপরে সে আসল কথা বলে। পঞ্চায়েত সমিতির মিটিং যখন দেরিই হয়ে গেছে, তখন আর এই মুহূর্তে মিটিং ডেকে অযথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। মিটিং-এর সিদ্ধান্ত লিখে খাতা ঘুরিয়ে অশোক

সবার সই করিয়ে নিক। সবারও সই করাতে হবে না, সাজানো মিটিং-এ কোরাম দেখালেই হবে। উন্নয়ন খাতে পঞ্চায়েত সমিতি সরাসরি যে কাজগুলো করবে, সেগুলো যেন তাড়াতাড়ি করে ফেলা হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের টাকা দিয়ে দেওয়া হোক। টিউবওয়েল এবং কালভার্টের ওয়ার্ক অর্ডার নিয়ে যেন ঝামেলা একদম না হয়। উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত করতে হলে ভুলত্রুটি হবেই। তার মানে এই নয় যে, সব কাজ বন্ধ করতে হবে। এই হ'ল তড়িতের নির্দেশ। অনর্গল কথা বলার পর তড়িৎ আবার সিগারেট ধরায়।

দীর্ঘসময় ধরে শান্তভাবে এইসব শোনার পর অশোক বলে, পঞ্চায়েত সমিতির সভা না ডেকে আমি কিছুই করব না তড়িৎবাবু।

তড়িৎ বিস্ময়ে পাথর হয়ে যায়। খানিকক্ষণ অস্বস্তিদায়ক দৃষ্টিতে অশোকের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, আমি বলছি, তবু করবেন না?

অশোক বলে, না।

—আপনার ডি এম কিন্তু আমার কথা শোনে, বি ডি ও সাহেব।

—ডি এম যদি আমাকে বে-আইনি কিছু বলেন, আমি করব না, এ আপনি নিঃসন্দেহ হতে পারেন।

এরকম গুরুতর পরিস্থিতিতে অনন্ত তার স্বভাব অনুযায়ী নিজস্ব ভঙ্গিতে মধ্যস্থতা করতে শুরু করে।

অনন্ত বলে, আপনি এত কঠোর হলে কী করে চলবে বি ডি ও সাহেব? না না, আমাদের এই অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে। বুঝতেই তো পারছেন গরীব মানুষের উন্নয়নের প্রশ্নে এত আইন-কানুন কি সবসময় মানা যায়?

অশোক বলে, গরীব মানুষ বলেই তো—

তড়িৎ আচমকা অনন্তকে ধমক দেয়, কেননা সে জানত অশোক উত্তরে কী বলবে। আর অশোককে সে শেষ পর্যন্ত বলতে দেবে, এমন হয় না। তাই সে অনন্তকে ধমক দিয়ে অশোককে থামিয়ে দেয়। বলে, থামো অনন্ত। বি ডি ও সাহেবের দোষ নেই। আমলাতন্ত্র

তার নিজের দাগের বাইরে কখনোই আসতে পারে না। আসতে পারলে তত্ত্বই ভুল হয়ে যেত।

অশোক এতক্ষণের এইসব কথাবার্তার মধ্যে নিজেকে ক্রমান্বয়ে অপমানিত এবং অসহায়ই দেখতে পায়। রাজনীতি-করা মানুষের হৃদয়হীনতা এমন এক পর্যায়ে পৌঁচেছে যে শুধুমাত্র নিজের দলের নয়, কিংবা নিজের গোষ্ঠীর নয়, এই কারণেই যে-কোনো মানুষকে বহু সময় অকারণ প্রতিপক্ষ হতে হয় এবং তারপর সেই প্রতিপক্ষের সঙ্গে যে-কোনো ব্যবহার করতেই আর বাধে না। চাঁদা দিতে আচমকা অস্বীকার করে মস্তানদের হাতে মানুষ যেভাবে নির্যাতিত হয়, যে-সব কথাবার্তা তাকে শুনতে হয়, অশোক এতক্ষণ যেন সেরকম একটা পরিমণ্ডলের মধ্যে ছিল। চাঁদা-প্রার্থীরা যদি আরো একটু কৌশলী হয়, অন্তত মুখে একটু শিষ্ট, তাহলে একটা মাঝামাঝি রফা হয়। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তেমন হয় না। হয় এই নরম কৌশলটা এখন অকেজো হয়ে গেছে, অথবা মস্তানরা ওটাকে নিজেদের কাছে অসম্মানকর মনে করে। অশোক হয়তো একটা মাঝামাঝি রফায় আসত, চাকরি করতে হলে হামেশাই যেমন করতে হয়, যদি না এই লোকগুলো ভয় দেখাবার মতো মূর্খামি করত। কোণঠাসা সম্ভ্রম তাকে বেপরোয়া করে, তাছাড়াও এতক্ষণের কথোপকথনে সে পরিশ্রান্ত হয়ে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। প্রাত মুহূর্তেই ভিতরের গুহায় আটকানো একটা ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ একটা ক্ষুধার্ত জানোয়ারের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল। আর প্রতিবারই সে সেটাকে জোর করে ঠেলে ভিতরে পাঠিয়ে দিচ্ছিল। এভাবে সে ক্লান্ত হয়েছে। এত ক্লান্ত হয়েছে যে তার পক্ষে আর ভিতরের দরজাটা ঠেলে বন্ধ রাখা সম্ভব হয় না।

তড়িতের এই শেষ কথার পরে সে ঝলসে ওঠে। ভদ্রসমাজে অপমান প্রতি-অপমানেও শিষ্টাচার মানতে হয়। অশোকের ইচ্ছা হয় এই ভদ্র পদ্ধতিকে ঝট্‌কা মেরে সরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিষ্পত্তি

করে। কিন্তু এই লৌকিক পদ্ধতি আবার আইনের অনুশাসনে এমন বাঁধা যে তৃপ্তির থেকে অনেক বেশি খেসারত দিতে হয়। কাজেই পরিশীলিত ভদ্র পদ্ধতি, যাতে প্রায় সময়ই সবচেয়ে দুর্বল জায়গায় আঘাত করতে হয়, অশোক ব্যবহার করে।

অশোক বলে, নিয়ম অনুসারে একটু বাড়াবাড়িই বলে, হ্যাঁ তড়িৎবাবু, আমি চোদ্দশো টাকা মাইনের আমলা, আপনাদের চার কাপ চা খাইয়ে মনে মনে পয়সার হিসাব করছি। একটা সস্তা সিগারেট খেয়েছি, ঘড়ি ধরে অপেক্ষা করছি, আরেকটা কখন খাব। শত অস্বস্তিতেও নিয়ম সহজে ভাঙতে পারি না। আর আপনি পার্টির হোল-টাইমার হয়ে এই সময়ের মধ্যে গোটা পাঁচেক আটটাকা প্যাকেটের সিগারেট খেলেন বিলিতি লাইটারে ধরিয়ে। এ-সব সম্বন্ধেও তত্ত্বে বোধহয় কিছু কিছু লেখা থাকে।

হিংস্র বিষাক্ত বাষ্প নোনাধরা ঘরের দেয়ালে দেয়ালে পাক খেতে থাকে। সত্য, মিথ্যা, ঈর্ষা, ক্ষমতার আস্ফালন, অক্ষমতার জ্বালা, দুঃসাহস এবং সন্ত্রাসের ছায়া ছোটো ঘরটার বাতাসকে ভারী করে তোলে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয় অশোকের।

এক মুহূর্তের জন্য তড়িতের বড়ো-সড়ো মুখখানা ভয়ংকর হয়ে যায়। কিন্তু সে শুধু এক মুহূর্তের জন্য। বুদ্ধিমান লোক সে। ওস্তাদ খেলোয়াড়ের ভঙ্গিতে সে সিগারেটের প্যাকেটটা অশোকের দিকে বাড়িয়ে ধরে। বলে, খাবেন নাকি এই সিগারেট একটা? এই সিগারেটের প্যাকেট এবং লাইটার দুটোই উপহার। কিছুক্ষণ পরেই ফুরিয়ে যাবে, তখন আবার বিড়ি খাব। তড়িৎ একটু হাসে, কিন্তু আঘাতের ক্ষত আড়াল করতে পারে না। তাই পরক্ষণেই বলে, বি ডি ও সাহেব, আমাদের প্রশাসনের আমলারা যখন সতীত্বের বড়াই করে, সে শুনতে ভারি মজা লাগে! হা—হা—

অশোকের উত্তর দিতে ইচ্ছা হয় না। তড়িৎ উঠে দাঁড়িয়েছে বেরিয়ে যাবার জন্য। সভাপতি উঠবে কি উঠবে না স্থির করতে

পারছে না। সমীর উঠে দাঁড়িয়ে অনাবশ্যক চেয়ারের শব্দ করে। তড়িৎ পা বাড়িয়েছে। কাল ইরাবতী বলেছিল, আমার নাম ইরাবতী অশোকবাবু। অশোক বলে, আমাদের দেশের রাজনীতিকরা ?

তড়িৎ পর্দা ঠেলে ততক্ষণে বাইরে। বাইরের থেকে বলে, এসো হে।

অনন্ত তবুও পকেট থেকে কাগজ বের করে একতাড়া। একগাল হেসে বলে, একবার চোখ বুলিয়ে নিন বি ডি ও সাহেব, এই লিস্ট-গুলোয়।

অশোক বলে, কিসের লিস্ট ওগুলো ?

সে হাত বাড়ায় না।

সমীর উঠে বাইরে চলে যায়।

অনন্ত বলে, কৃষি অফিস থেকে রবি মরশুমের মিনিকিট দেওয়ার জন্য আপনার কাছে নাম চায়নি ? ছ'টা অঞ্চলের নামের লিস্টই আমরা তৈরি করেছি।

—এ লিস্ট কি গ্রাম পঞ্চায়েত তৈরি করেছে ?

—ওই একরমক তাই ধরতে পারেন।

—ধরাধরির কিছু নেই অনন্তবাবু। গ্রাম পঞ্চায়েত লিস্ট পাঠাবে, পঞ্চায়েত সমিতির মিটিংয়ে সেগুলো পাস হবে। তবেই কৃষি অফিসে ফাইন্যাল লিস্ট যাবে।

অনাদি উঠে বেরিয়ে যায়।

অগত্যা অনন্তও।

বিনয় তৃতীয় দিনের সন্ধ্যাবেলাতেই ফিরে এসেছিল। পরদিন জীপ নিয়ে অশোক সদরে আসে। গত দু'দিন ধরে সে পরিমলের বিষয়ে একটা রিপোর্ট তৈরি করেছে। সে চাইছিল অন্তত অফিসটা একটু পরিষ্কার হোক। স্বীকার করতে লজ্জা নেই সে একটু প্রতিশোধ-পরায়ণ হয়ে পড়েছিল। এখানে তাকে তিন-চার বছর থাকতে

হবে। কাজেই অফিসটা খানিকটা পরিচ্ছন্ন না হলে অশান্তি দিন দিন বাড়বে, এটা সে বুঝেছিল। রিপোর্টে সে পরিমলের বদলির সুপারিশ করেছিল।

কালেক্টরেটে সে যখন পৌঁছোয়, তখন এগারোটা বাজে। বিনয় জিজ্ঞেস করেছে, আপনার কতক্ষণের কাজ স্যার?

অশোক বলেছে, ধরে নিন সারাদিনের। কেন?

—গাড়িটার কিছু সার্ভিসিং দরকার। করে নিতাম।

—করে নিন। আর চারটে নাগাদ খোঁজ করবেন।

কালেক্টরেটে সে সুদীপের ঘরে যায়। সুদীপ জেলা পঞ্চায়েতের বিশেষ অফিসার, অশোকের থেকে বছর চার-পাঁচের সিনিয়র।

সুদীপের চশমার কাচ ভারী, ফলে দৃষ্টি অন্তর্ভেদী। অশোক তাকে পছন্দ করে, হয়তো একটু ঈর্ষাও করে তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কারণে। সুদীপ মানুষ ও ফাইলের জটিলতা খুব সহজে ও দ্রুত বোঝে, সিদ্ধান্ত নেয় নির্ভুল।

পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকতে সুদীপ চোখ তুলে বলে, আয়।

সুদীপের চেম্বার সাজানো। বড়ো টেবিলের ওপারে তার দামী চেয়ার, এপারে দু'সারি সাধারণ চেয়ার মোট দশখানা। অশোক প্রথম সারির মাঝের চেয়ারখানায় সুদীপের মুখোমুখি বসে। সুদীপ বেল বাজিয়ে চা আনতে বলে।—তারপর অশোকের মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে বলে—তোকে খুব ডিপ্রেসড্ লাগছে, ঝামেলা বাঁধিয়েছিস পঞ্চায়েতের সঙ্গে, না?

অশোক বলে, পঞ্চায়েতের সঙ্গে আর কোন্ বি ডি ও-র সম্পর্ক ভালো থাকে?

সুদীপ বলে, এটা তোর আরেকটা ভুল ধারণা। অনেক বি ডি ও-র সঙ্গেই পঞ্চায়েতের সম্পর্ক খুব ভালো।

—অ্যাসোসিয়েশনের রিপোর্ট কিন্তু সে কথা বলে না সুদীপদা।

—রিপোর্টের কথা বাদ দে। রিপোর্টে সব কথা নেই। বিরোধের

কথা সবিস্তারে আছে, সদ্ভাবের কথা নেই। অনেকভাবে সদ্ভাব থাকতে পারে। তোকে তত্ত্ব দিয়েও ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে পারি।

—যেমন ?

—যেমন, পঞ্চায়েত আর বি ডি ও যদি একই রাজনৈতিক আদর্শের লোক হয়, যদি বি ডি ও কোনো ঝামেলায় যেতে না চায় এবং চোখ বুজে কাগজে সই করে, যদি বি ডি ও বেশ ম্যানেজ মাস্টার হয় এবং পঞ্চায়েতকে ক্রমাগত টুপি পরাতে পারে, যদি পঞ্চায়েত-চেয়ারম্যান ঐ রকম হয় এবং বি ডি ও-কে টুপি পরাতে পারে, যদি বি ডি ও এবং চেয়ারম্যান দুজনেই বেশ সৎ আর আইনকানুন মেনে চলা লোক হয়, যদি বি ডি ও, চেয়ারম্যান—দুজনেই চোর হয় আর পরস্পর পরস্পরকে দেখে—এরকম অসংখ্য সম্ভাবনা তোকে দেখাতে পারি।

চা আসে। অশোক চায়ে চুমুক দিয়ে বলে, ওই যে শেষ কথাটা বললে না যে, যদি দুজনেই বেশ চোর হয়, একমাত্র তাহলেই সদ্ভাব থাকতে পারে। আমাদের মতো মানসিকতার লোকের পক্ষে নাহলে—

—ও-সব মানসিকতা-ফানসিকতার কথা খুবই অবান্তর। কোনো শর্ত করা চলবে না। তা যাক্ সে-সব কথা। কাল তোর চেয়ারম্যান এসেছিল। সঙ্গে তড়িৎবাবুও ছিল। ডি এম-এর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলে গেছে। আমার ঘরেও এসেছিল।

—তবে তো একতরফের বক্তব্য শুনেইছ।

—শুনেছি, তোর কথাও শুনতে চাই। ডি এম কাল আমাকে ডেকেছিল। তোর সঙ্গে কথা বলে ঝামেলা মেটাবার ব্যবস্থা করতে বলেছে।

—আইনমতো কাজ করতে গেলেই ঝামেলা হচ্ছে। এত চোরের সঙ্গে কাজ করব কীভাবে ?

অশোক ব্লকের যাবতীয় গণ্ডগোল সবিস্তারে বলে, বাদ থাকে শুধু ইরাবতী বৃত্তান্ত। সুদীপ ধৈর্য ধরে সব শোনে। সে বেশ গম্ভীর হয়ে

থাকে। শেষে বলে, তোর পক্ষে ওখানে কাজ করা খুবই মুশকিল, এটা বুঝতে পারছি। কিন্তু চাকরি করতে হলে—

—চাকরি করতে হলে সব মানসম্মান, সুস্থ অনুভূতি বিসর্জন দিতে হবে ?

— কিছু মনে করিস না অশোক, তুই একটু বেশি দাম্ভিক।

—তোমার থেকেও ?

—চুরি নিয়ে এত লাফাচ্ছিস কেন ? চুরি কি শুধু পঞ্চায়েতের লোকেরা করে, আমরা করি না ?

—আমরা চুরি করি ?

—আকাশ থেকে পড়লি যে ! করি না ? চুরি করি, সরকারের অন্যায় সুবিধা নিই, আরো অনেক কিছু করি।

—আমি করি না।

—করিস। নিজের ব্যাপার তো, নিজের কাছে পরিষ্কার ধরা পড়ে না। গাড়ি নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে না এমন সরকারি অফিসার নেই। সরকারি কর্মচারীকে দিয়ে নিজের কাজ করায় না এমন ডেপুটি নেই।

অশোক খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলে—সুদীপদা, এগুলো আমি করি না।

সুদীপ বলে, এখনো যদি না করিস, কালেক্টরেটে এলে করবি। যখন আমরা সবাই মিলে সিনেমায় যাব, কিংবা ফরেস্ট বাংলোতে পিকনিক করতে যাব, তখন সরকারি গাড়িতে আমাদের সঙ্গে তুইও থাকবি। সেই সিনেমা মালিক যাতে আমরা টিকিট না কাটি তার জন্য এমন পীড়াপীড়ি আমাদের করতে থাকবে এবং এমন বিব্রত আমাদের করে ফেলবে যেন সত্যিই টিকিট কাটলে ওই লোকটাকে খুবই আঘাত করা হবে। তার ফলে তুইও আমাদের সঙ্গে বিনা পয়সায় সিনেমা দেখবি।

অশোক চুপ করে থাকে।

সুদীপ আবারও বলে, তুই এগুলো জানিস এবং এই ছোটোখাটো

ত্রুটিগুলো আমাদের বিবেকের সহনশীলতার মধ্যে এসে যায়। তুই যখন কালেক্টরেটে আসবি, তখন দেখবি আরো অনেক কিছু সহ্যের আওতায় আসবে। তখন দেখবি, কোন্ বি ডি ও কনট্রাক্টরের সঙ্গে সিমেণ্টের বন্দোবস্ত করে নিজের গ্রামের বাড়ি পাকা করছে, দেখবি কোন্ ডেপুটি রাস্তাতেই গাড়ির তেল বেচে মদের বোতল কিনছে, কেউ স্টেশনারির এক বিল চারবার পেমেণ্ট করছে, দোকান থেকে স্টিরিও, টেপ-রেকর্ডার ইত্যাদি কিনছে—তার বিল অন্য কেউ দিচ্ছে। বড়ো সাহেবদের মরা বাপের শ্রাদ্ধের খরচ নেজারৎ থেকে বিলে পেমেণ্ট হচ্ছে, এ শুনেও তখন চমকে যাবি না। জামা-কাপড় পর্দা কম্বল বাসন-কোসন সাবান পাউডার ইত্যাদি স্টেশনারি, ইলেকট্রিক বিল, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সার্কিট হাউসে বসে আনন্দফুর্তি এবং ডিনারের বিল—সব সরকারি নাজিরখানা থেকে পেমেণ্ট হয়। বিশ্বাস না হয়, এন ডি সি (নেজারৎ ডেপুটি কালেক্টর) অবনীর মাথাটা একবার নেড়ে দেখে আয়।

অশোক কেমন নার্ভাস বোধ করে। হঠাৎ করে কথা বলতে পারে না।

সুদীপ আবার বলে, তোকে আরো বলছি, এই জিনিসগুলো দু-চার বছর পরে তোর আর এত খারাপ লাগবে না। এগুলো বহুকালের একটা সিস্টেমের অঙ্গ। এগুলো ব্যবস্থার মধ্যে এমনভাবে ঢুকে আছে যে, চট করে মানুষের চোখে লাগে না। আর দীর্ঘকাল ধরে বিষয়টা চলে আসাতে খুব একটা অন্যায় বা বে-আইনি বলে মনেই হয় না। আমার এক বন্ধুর দাদা বছর কুড়ি আগে ডেপুটি ছিলেন, এখন রাইটার্সের এক বড়ো পোস্ট দখল করে আছেন। তিনি যখন মেদিনীপুরের কোনো এক সাব-ডিভিশনের এস ডি ও, আমি তখন সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ঐ রকম দৃঢ় নৈতিক চরিত্রের মানুষ আমি জীবনে আর একজন দেখিনি। সৎ অসৎ বোধ তার এমন অনমনীয় ছিল যে, চাকরি জীবনেও এর জন্য তাঁকে মূল্য দিতে

হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য কী জানিস ? তার বাড়িতেও আমি একজন নাইটগার্ড, একজন পাঙ্খাপুলার এবং একজন পিওনকে দিনের অনেক সময় কাজ করতে দেখেছি।

সেই একই জিনিস তুই অনাদি কিংবা তড়িতের মধ্যে দেখলে অমন সোরগোল তুলবি কেন ?

অশোক চুপ করে থাকে। সুদীপের কথা বলার একটা বিশ্বাসযোগ্য ভঙ্গি আছে। হয়তো যুক্তিও কিছু আছে, কিন্তু সে যুক্তি হতাশ ও নেতিবাচক, ক্রমাগত মেনে নেওয়ার যুক্তি।

সুদীপ বলতে থাকে—কেন ? চোরের বাজারে এই লোকগুলো নতুন বলে ? একটা উদাহরণ দিই, হয়তো চরম উদাহরণ, কিন্তু এরকমও হয়। কোন্ এক ঝিয়ের মেয়ের পেটে কোন্ এক আই এ এস-এর বাচ্চা এসেছিল। গর্ভপাতের খরচটা রিলিফের নামে ডাইভার্ট করে সবদিক বাঁচানো হয়েছে !

অশোক বলে, এ-সব বলে তুমি আমাকে আসলে কী বোঝাতে চাও ?

—আমি তোকে কিছু বোঝাতে চাই না। তুই যা করছিস, তা ভুল কি ঠিক, আমি তাও দেখাতে চাই না। আমি যা তোকে দেখাতে চাই, তা হচ্ছে একটা ছবি আমাদের এই সম্পূর্ণ বন্দোবস্তের।

—ছবিটা ভয়াবহ, কিন্তু তুমি যেভাবে বললে ব্যাপারটা এমন ব্যাপক বোধহয় নয়।

সুদীপ একটু হাসে। বেল টিপে আবার সে দু'কাপ চা আনতে বলে। তারপর বলে, তুই এমন ন্যাকা সাজছিস কেন ? যেন এ-সব কোনোদিন দেখিসনি, শুনিসনি !

অশোক বলে—দেখেওছি, শুনেওছি। কিন্তু এমন যে ভয়াবহ, তা এখনো ভাবতে চাইছি না।

—এখন তাহলে ভাবো।

—কেন ?

—ডি এম তাই চাইছে। ডি এম চাইছে যে টুপিটা তুই পরিস।

—কেন ?

—কাগজে কলমে উন্নয়নের যে পরিসংখ্যান আসবে তার উপরে ডি এম-দের সি সি আর, ভালো পোস্টিং এ-সব নির্ভর করছে, সেইজন্য।

—তুমিও কি তাই বলছ ?

—না, আমি তোকে কিছু বলছি না।

—তুমি যখন ব্লকে ছিলে, তখন তো নিজের হাতেই একজনকে ঠেঙিয়েছিলে শুনেছি ?

—ঠেঙাতে আমি এখনো পারি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ওটাই রাস্তা। বেশ সফলভাবে ঠেঙাতে পারলে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, আর কিছু হয় না।

—কিন্তু আমি চাই, তুমি আমাকে কিছু উপদেশ দাও !

—আমি তোকে কোনো রাস্তা দেখাতে পারব না। কেননা আমি নিজেই জানি না রাস্তাটা কী !

—তার মানে, আমি আমার মতো চলব ?

—নিশ্চয়ই।

—আমি তোমাকে একেবারেই বুঝতে পারছি না। এলাম তোমার কাছে পরামর্শ চাইতে, আর তুমি ব্যাপারটা ক্রমাগত এড়িয়েই চলছ।

সুদীপ বেশ-কিছু সময় নিশ্চুপ বসে সিগারেট খায়। অশোক অপেক্ষা করে, কেননা সুদীপের উপর তার কিছুটা ভরসা আছে। হয়তো, নীরবতার শেষে সুদীপ কিছু-একটা বলবে যাতে অশোক যা-হোক-একটা রাস্তা খুঁজে পাবে।

সুদীপ খুব বিষণ্ণভাবে বলে, একসময় কেউ পরামর্শ চাইলে নিজের বোধবুদ্ধিমতো পরামর্শ দিতাম। তখন আস্থা ছিল নিজের উপর। পরে বুঝেছি এও এক মিথ্যা আত্মবিশ্বাস। বিষয়গুলো এত জটিল যে সিদ্ধান্ত প্রায়ই ভুল হয়।

অশোক বলে—হোক ভুল, তবু কিছু বলো। আমার ব্লকে সত্যিই একটা অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। সবসময়ের অশান্তি। আমি এর হাত থেকে নিষ্কৃতি চাই। আবার নিজের সততা, নিরপেক্ষতা এবং বিবেকও নিষ্কলুষ রাখতে চাই।

—তাহলে পঞ্চায়েতের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেল। তাতে যদি তোকে কিছুটা ছোটোও হতে হয়, কিচ্ছু যায় আসে না।

—বিরোধ মেটাতে হলে তো সমস্ত রকম কনসেশন মেনে নিতে হবে। আর একবার মানতে শুরু করলে, তারপরে আর পিছন ফিরে তাকাবার সুযোগ পাওয়া যাবেনা। আমার ধারণা. যে-সব বি ডি ও-রা পঞ্চায়েত কিংবা পলিটিক্যাল পার্টির হাতে নিগৃহীত হয়েছে, তারা এই ভুলটাই করেছে।

—ভুল তারা নিশ্চয়ই কিছু করেছে। কিন্তু তোকে আমি আবার বলছি, যারা মার খেয়েছে, তাদের সবাইকে পবিত্র শহীদ ভাবার কোনো কারণ নেই। তুই যদি বুঝিস যে উন্নয়নের কাজটা করা দরকার, আর তাতে অগণিত সাধারণ মানুষ কোনো-না-কোনোভাবে জড়িত, তাহলে এই যুক্তিতেই তো অভিমান ত্যাগ করা যায়।

—এই পদ্ধতিতে উন্নয়ন হবে ?

—কোন্ পদ্ধতিতে হবে ?

অশোক চুপ করে থাকে।

সুদীপ আবার বলে, এরকমভাবে হবে না—আমাদের মধ্যে অনেকেই এ ব্যাপারে নিশ্চিত। কিন্তু কোন্‌রকমভাবে হবে তা যদি কেউ বলে দিত ! আবার এভাবে যে হবে না সেটাও কিন্তু আমাদের দু-চারজনের কাণ্ডজ্ঞানের মধ্যেই আছে। সবচেয়ে বড়ো কথা হল, এ হচ্ছে পলিসি ম্যাটার, তোর আমার এ নিয়ে কিছুই করার নেই। এতে যদি অশান্তি পাস, তবে বলব আগে ঠিক কর্ চাকরি করবি কিনা। তাছাড়া, এই প্রশ্নের সঙ্গে বিরোধের কিন্তু সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো বি ডিও-র সঙ্গে পঞ্চায়েতের বিরোধ, সরকারি

অফিসারের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতার বিরোধ, এর ভেতরে আমরা সাধারণভাবে যে কারণগুলো দেখি, তার বাইরেও কিছু গুরুত্বপুর্ণ কারণ রয়েছে। ওরা যেগুলোকে আমলাতান্ত্রিক বলে এবং আমরা যেগুলো কদাচিৎ মেনে নিই, সেগুলোই আমার ধারণা বিরোধের বড়ো একটা কারণ।

—যেমন ?

—যেমন, তোর সভাপতি তোর ঘরে ঢুকলে তুই কি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াস ?

অশোকের চোখেমুখে স্পষ্টই বিরক্তি এবং বিব্রতভাব। সে চুপ করে থাকে।

—তোর এলাকার এম এল এ কিংবা এম পি তোর ঘরে এলে তুই উঠে দাঁড়িয়ে সসম্মান অভ্যর্থনা করিস ?

অশোক এখনো চুপ করে থাকে।

—ডি এল সি সি, ডি সি সি ইত্যাদি জেলাস্তরের মিটিং তো দু-একটা দেখেছিস ? হলে যখন ডি এম কিংবা এ ডি এম ঢোকে, দু-তিন মিনিট ধরে উঠে দাঁড়ানোর এবং ফের বসে পড়ার সন্ত্রস্ত চেয়ারের শব্দ শোনা যায়। কিন্তু আমাদের নিরীহ সভাধিপতি মাখনবাবু যখন ঢোকে, কেউ উঠে দাঁড়ায় না। তোর কখনো মনে হয়েছে যে এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার।

অশোক হেসে বলে, সত্যিই এ জিনিসগুলো অভ্যাস করা কঠিন। সুদীপ বলে, কঠিন নয়। সভাধিপতি মাখনবাবু না হয়ে যদি তড়িৎবাবু হ'ত, তবে ঠিক পেছনে লাথি মেরে আমাদের দাঁড় করিয়ে রাখত। কেননা এ ব্যাপারে সরকারি নির্দেশ ওদের পক্ষে। তুই হয়তো জানিসই না যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে ব্যবহাররীতির একটা সার্কুলার আমাদের দেওয়া আছে।

—সত্যিই জানি না।

—মূল বিরোধটা কিন্তু ওখানেই—কে কর্তৃত্ব করবে ? ডি এম না

সভাধিপতি, বি ডি ও না সভাপতি, পার্টি না আমলা। সুতরাং সততা, অসততা পরিকল্পনার ত্রুটি, রূপায়ণের অসুবিধা—এগুলো বোধহয় আসল কারণ নয়। ওগুলোর জন্য ত্ব'পক্ষই সমান দোষী—যদি দোষ দিতেই হয়।

অশোক বলে, কিন্তু সব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ? আইনকে তোয়াক্কা না করা?

সুদীপ বলে, এটা তুই খানিকটা সত্যি বলেছিস। তবে হস্তক্ষেপ নয়। হস্তক্ষেপের ব্যাপারে আমার আগের কথায় ব্যাখ্যা আছে। তবে আইনটা আমরাই একটু বেশি মানি। তার কারণ এই নয় যে আমরা খুব আইনানুগ। তার কারণ আইনটা ওদের থেকে আমরা বেশি বুঝি, আইনের ফাঁকগুলোও বেশি কাজে লাগাতে পারি। আর সবচেয়ে বড়ো কারণ, আমরা চাকরি করি—ওরা করে না। চাকরির খাতিরে আইন আমাদের কিছুটা মানতেই হয়।

অশোক বলে, তুমি যেভাবে সব বিশ্লেষণ করছ, তাতে সবই মেনে নিতে হয়, কারুর আর কিছু করার থাকে না।

সুদীপ বলে, বিষয়টা যতই খারাপ লাগুক, আসলে কিন্তু প্রায় তাই। আমাদের এখন ত্বটো বিকল্প আছে। হয় চুরি-চামারি করো, ঘুষ খাও, সমস্ত-কিছুর সঙ্গে আপস করো, ভালো ভালো জামাকাপড় পরো, সব সাধারণ মানুষকে পোকামাকড়ের সমান জ্ঞান করো। লোকে বলবে, হ্যাঁ একটা ডেপুটি বটে! হাঁটলে পরে গুম গুম শব্দ হয়! আর অন্যটা হ'ল, কঠোর অধ্যবসায়ের? সঙ্গে নিজেকে আইনের কাঠামোর মধ্যে ধরে রাখবে, যাতে কেউ তোমাকে কিছু না বলতে পারে, আবার বিবেকও বেশ নিরুত্তেজ থাকে। যদি নেহাৎই কখনো সামান্য বাঁয়ে হেলতে হয়, পরক্ষণেই ডাইনে হেলে ভারসাম্য ঠিক করবে। সবদিক বাঁচিয়ে শুধু চাকরিটি করে যাওয়া, মেয়াদ শেষ করা। ব্লক থেকে সদরে আসবি, এসে আই এ এস-এর কেরানি হবি, সে পর্ব শেষ হলে এস ডি ও হবি, তারপর কপাল ভালো থাকে তো

রাইটার্সে গিয়ে ডেপুটি সেক্রেটারি হয়ে মোক্ষ লাভ করবি। আরে, দত্তসাহেব, আসুন।

—আই ডোণ্ট এগ্রি উইথ ইউ অ্যাবসলিউটলি, মিঃ মিত্র। বলতে বলতে যে ব্যক্তি চেয়ারে এসে বসে, সে পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন বছরের একজন দীর্ঘাঙ্গ এবং শক্তিশালী মানুষ। ধূসর একজোড়া গোঁফ তার চেহারায় বেশ মানানসই। হাবেভাবে এবং চাহনিতে বেশ আড়ম্বর আছে এবং সেই আড়ম্বর প্রকাশেরও একটা উপচে পড়া ভাব আছে লোকটির।

সুদীপ বলে, আলাপ করিয়ে দি'—অশোক রায়, পানজোড়ার বি ডি ও, আর মিস্টার মন্মথ দত্ত, ডি এস পি, হেড কোয়ার্টার।

মন্মথ অশোকের নমস্কারের জন্য উত্তোলিত হাত টেনে নিয়ে করমর্দন করে এবং অনুবাদ করে বলে, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভারি খুশি হলাম।

তারপর সুদীপের দিকে তাকিয়ে বলে, ভেরি সরি ফর ইণ্টারফ্যারেন্স্। কিন্তু আমাকে বলতেই হবে যে আপনার দুটি বিকল্পই আপাতত অবসলেট।

সুদীপ হাসছিল। বলে—বলুন, আপনার মতটাই শুনি।

মন্মথ বলে, প্রথমত দাপটের দিন আর নেই। দাপটের দিন শেষ হয়ে গেছে। আর সব-কিছু করতে পারবেন, কিন্তু নো দাপট। ষোলো-সতেরো বছর আগে থেকেই দাপট উবে যেতে শুরু করেছে, বুঝলেন! ঠিক এই ব্যাপার নিয়েই সিক্সটি নাইনে এক ডি এম-এর সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। আমি তখন দারোগা—মাইণ্ড ইউ, ও সি নয়, দারোগা। আমার এলাকায় একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল। তাই ডি এম সাহেব এসেছিলেন। এই আপনাদের বয়সী এক ছোকরা, আই অ্যাম সরি, যুবক। প্রশ্ন করলেন, কেন সঙ্গে সঙ্গেই হাঙ্গামা দমন করা যায়নি? আমি বললাম, দাপটের দিন শেষ স্যার। বললেন, হোয়াট ডু ইউ মিন? বললাম, দেখুন

তাহলে। বলেই হাঁক দিলাম—চৌবে! সঙ্গে সঙ্গে, খেয়াল করবেন, সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর এল—হুজৌর—এবং তার পর পরই—খটাস্। ডি এম সাহেব দেখলেন চৌবেকে। পাক্কা ছ'ফিট, পাকা গমের মতো গায়ের রঙ, ফুল ইউনিফর্ম, ডন-বৈঠক করা স্বাস্থ্য। বললাম—সাবকা লিয়ে চায়, তুরন্ত্। সঙ্গে সঙ্গেই আবার খটাস্, তারপর টু স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড, তারপর অ্যাবাউট টার্ন।

ডি এম সাহেব বললেন, মানে?

বললাম, হয় নি স্যার, প্লীজ ওয়েট। আবার হাঁক দিলাম, ব্যানার্জি। সাড়া নেই।

আবার হাঁক—ব্যানার্জি।

অনেকদূর থেকে উত্তর এল, যাই স্যার। তারপরেই বারান্দা দিয়ে চপ্পলের ফটর্ ফটর্ আওয়াজ। ঘরে ঢুকে ওই চপ্পলই একসঙ্গে জোড়া করে হাত কপালে তুলল। শার্ট প্যাণ্টের ভিতরে ঢোকানো নেই, ইস্তিরি নেই, একগাল পান এবং 'বলেন স্যার' অত্যন্ত মিহি ও হরিব্‌ল্। চেহারা ডিস্‌পেপ্‌টিক। বললাম, সাহেবের জন্য এক প্যাকেট ভালো সিগারেট নিয়ে এসো। অ্যাণ্ড শক্ অব শক্‌স! ডি এম-কে শিক্ষা দিতে গিয়ে আমি আমার জীবনের চরম শিক্ষাটি পেয়ে গেলাম। ছোকরা বলল কী জানেন? বলল, টাকা দিন স্যার। হারু বলেছে, বাকিতে আর সিগারেট দেবে না।

টাকা দিলাম। ব্যানার্জি চলে গেল। ডি এম-কে বললাম, দেখলেন তো স্যার? আমার দশজন ফোর্সের মধ্যে ন'জন হল এই ব্যানার্জি, মুখার্জি, দত্ত, দাস—এইসব। আর মাত্র একজন চৌবে! একজন চৌবে—দি লাস্ট ডগ।

হাসবেন না, মিস্টার মিত্র। ওবিডিয়েণ্ট লাইক এ ডগ অ্যাণ্ড আনপ্যারালাল ইন অ্যাকশন। অ্যাকশনের সময় তো দেখেছি—স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। হাতের আর মুখের পেশী শুধু মাঝে মাঝে থির থির করে কেঁপে উঠত রেসের ঘোড়ার

মতো। অর্ডার-এর জন্য অপেক্ষা। অ্যাণ্ড দি মোমেন্ট অর্ডার ইজ আউট – হাঃ!

সুদীপ বলে, আপনি ঠিকই বলেছেন। সে-সব দিন আর ফিরে আসবে না।

অশোক চুপচাপ বসে থাকে। তাদের দু'জনের কথার মধ্যে এই লোকটার অনুপ্রবেশে সে একটু বিরক্তই বোধ করে।

কিন্তু মন্মথ নির্বোধ নয়। বলে, কিন্তু আপনাদের আলোচনায় বোধহয় বিঘ্ন ঘটালাম। বাট আই মাস্ট সে যে, আপনার দ্বিতীয় বিকল্পটিও সমান ত্রুটিপূর্ণ। সবদিক বাঁচিয়েও কিছু করা সম্ভব নয়। নিরপেক্ষতার অর্থ হ'ল প্রশাসনের পক্ষে থাকা। আপনি কি তা আর কখনো পারবেন? যদি পারেন তবে কোনো-না-কোনো পক্ষকে শত্রু বানিয়ে ফেলবেন। আরেকটা সত্যকথা গোপনে বলি, মানুষ কখনোই নিরপেক্ষ হতে পারে না।

সুদীপ বলে, তাহলে দিনকাল যেভাবে পাল্টেছে, তাতে ঠিক কীভাবে নিজের বিবেক এবং সততা –

মন্মথ সুদীপের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলে, – নিয়ে চাকরি করবেন, এই তো? ওই বিবেক এবং সততা কথাদুটো বাদ দিলে (কেননা প্রশাসনের কাছে কোনোদিন কোনোদেশে ঐ দুটো কথার কোনো অর্থ ছিল না আর থাকা সম্ভবও নয়) আমি এ সম্বন্ধে দু-চারটে কথা বলতে পারি। কেননা শাসন এবং আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে ওই দুটো শব্দ নেই। অর্ডার ইজ অর্ডার। আমরা এইভাবেই শিখেছি।

অশোক বলে, মানে অর্ডারেরও বিবেক থাকতে নেই?

মন্মথ অশোকের দিকে তাকায় এমন এক দৃষ্টিতে যার অর্থ, তোমার মতো চালাক ছোকরা আমি অনেক টিট্ করেছি হে! এবং সে একটু হাসে। বলে – না বি ডি ও সাহেব, নেই।

অশোক বলে, তা যদি না থাকে, তবে তো আর কোনো ঝামেলাই নেই।

মন্মথ বলে—আছে, সমস্যা আছে। সে হ'ল আইনের সমস্যা। অথবা আরো পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে, আইন কার্যকরী করার সমস্যা। বুঝেছেন?

সুদীপ বলে, পরিষ্কার বুঝলাম না ডি এস পি সাহেব।

মন্মথ বলে—বুঝবেন অবশ্যই বুঝবেন। একটু পরিষ্কার করে দিলেই বুঝবেন। ধরুন আপনি আইন কার্যকরী করবেন, কীভাবে করবেন? অ্যাপ্লায়িং ফোর্স, বেটার সে ব্রুট ফোর্স। তত্ত্বগতভাবে ব্যাপারটা মানেন কি না, আগে সেটা বলুন। সুদীপ বাধা দিতে চায় না। বলে, ডাজ নট ম্যাটার, আপনি বলুন।

—আইন কার্যকরী করবার জন্য আপনাকে ফোর্স অ্যাপ্লাই যখন করতে হবেই, তখন সেই অ্যাপ্লিকেশন আইনি হচ্ছে না বে-আইনি হচ্ছে—এটা দেখা অবান্তর। কেননা স্টেট মেশিনারি, মাইণ্ড ইউ, মেশিনারি ইজ এবাভ ল। আপনি যখন আইনকে কার্যকরী করবেন তখন আপনি এবাভ ল। কারেক্ট্? মন্মথ তারপর অশোকের দিকে তাকিয়ে বলে, আপনার বিবেকের নতুন ডাইমেনশন আইনকে কার্যকরী করা। এটা যদি করতে পারেন, পরিস্থিতি যাই হোক-না কেন, প্রতিবন্ধকতা যতই আসুক, আপনি কাজে উৎসাহ পাবেন, চ্যালেঞ্জের মুখে নিজেকে, অনেক বেশি উদ্দীপ্ত দেখবেন।

অশোক বলে, প্রথমে বললেন—নিরপেক্ষতা বলে কিছু নেই, তারপর বললেন—সততা, বিবেক বলেও কিছু নেই, আর সবশেষে বললেন, আইনকে কার্যকরী করাই হচ্ছে আমার বা আপনার কাজ। তাহলে এই গোটা ব্যাপারটাই পরস্পরবিরোধী হয়ে যাচ্ছে না?

মন্মথ তার বড়ো গোঁফের ফাঁকে একটু যেন অনুকম্পার হাসিই হাসে। সে বলে, আপনারা আজকালকার শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় অনেকেই কমবেশি প্রগতিশীল। প্রগতিশীলতার ধ্যান-ধারণা আমাদের দেশে কম্যুনিস্ট ধ্যান-ধারণার নামান্তর, এ কথা আমিও মানি। আমার ছেলেরা তো পুরোপুরিই কম্যুনিস্ট। কিন্তু এইসব তত্ত্বের

প্রাথমিক শর্তগুলো কিন্তু আপনারা অসাবধানে ভুলে যান। আপনি 'নিরপেক্ষতা, সততা এবং বিবেক' এই তিনটি শব্দের আগে 'শ্রেণী' কথাটি জুড়ে দিয়ে দেখুন তো কী অর্থ দাঁড়াচ্ছে? কোনো অর্থ দাঁড়াচ্ছে না, এমন-কি পরিষ্কার কোনো ধারণাও নয়। কিন্তু 'আইন' এই শব্দের আগে 'শ্রেণী' কথাটি জুড়ে দিন, দেখবেন কেমন জোরাল অর্থ দাঁড়াচ্ছে, যা আপনি বোঝেন—মানেন। এতদিন পুলিশে চাকরি করে আমি ব্যাপারটা হয়তো আপনাদের অনেকের চাইতে বেশি বুঝি। আপনি ধরেই নিয়েছেন যে, আইন হচ্ছে নিরপেক্ষ, সৎ এবং বিবেকসম্পন্ন। কিন্তু আমি এগুলোর কোনোটাই বলিনি। আমি আইনকে শ্রেণী আইন বলেই জানি। কাজেই আমার বক্তব্যে কোনো স্ববিরোধ নেই বি ডি ও সাহেব।

অশোক ধরেই নিয়েছিল যে মন্মথ প্রথাগত যুক্তি দেখাবে। কিন্তু সে যে এমন মারাত্মক একটা মোচড় দেবে, সে স্বপ্নেও ভাবেনি। এরকম একজন স্থূল প্রয়োগবাদী লোক হঠাৎ এমন একটা নিশ্ছিদ্র যুক্তি দেখাবে, এই বা কী করে সহ্য করা যায়? অশোক নিজেকে ভীষণ খর্বাকৃতি বোধ করে। সে বলে, আমি কম্যুনিস্ট নই ডি এস পি সাহেব। তবে আপনার এই যুক্তিটা মানলাম। কিন্তু তাতে সব মিলিয়ে যা দাঁড়াল তা তো অতি ভয়ংকর। এইসব বুঝেসুঝে একটি পাক্কা শয়তান না হলে আর চাকরি করে সুখ নেই।

মন্মথ রাগে না। সে যেন জানে যে অশোককে যতটুকু উত্তাপ দেওয়া হয়েছে, তাতে সে আরো বাষ্প ছাড়বে। আলোচ্য বিষয়ের উপর পূর্ণ আধিপত্য থাকলে যতখানি পণ্ডিতি দেখানো যায়, ততখানিই সে দেখায়। বলে, জানি বিষয়টা হজম করতে আপনাদের কষ্ট হবে, বাট কাণ্ট হেল্‌প্‌। বইয়ে পড়ে এসেছেন যে, আইনের পরিধির মধ্যেই আইনকে কার্যকরী করতে হবে, আর আমি বলছি উল্টো। তাই না? কিন্তু এস ও পি ডি সাহেব, সারা জীবন ধরে দেখবেন প্র্যাকটিস-এর সঙ্গে এইসব থিওরির কোনো মিল নেই।

আইনকে কার্যকরী করতে প্রতি মুহূর্তে আইনকে ভাঙতে হবে। ক্রমে এই আইনভঙ্গকারী পদ্ধতি আইনসভার অনুমোদন নিয়ে সিদ্ধ হবে। ঠিক কিনা ?

সুদীপকে একটু হেসে স্বীকার করতে হয়, হ্যাঁ ঠিক।

মন্মথ বলে, একদম ঠিক। আরেকটা কথা মনে রাখবেন, প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলার এই জটিল এবং নির্মম ব্যবস্থার মধ্যে যত ঢুকে যাবেন, ততই আনন্দ আর উত্তেজনা পাবেন। আপনার ওই সব দিক বাঁচিয়ে কাজ করার যে প্রবণতা, ক্ষমা করবেন, সেটা এসকেপিজম্ ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না তখন।

যেন খুব একটা রসিকতা হয়েছে, এভাবে মন্মথ হা হা করে হাসে।

সুদীপ বলে, কিন্তু ওই-যে বললেন, দাপটের দিন শেষ, তাহলে কী করে আর এভাবে কাজ করবেন ?

মন্মথ একটু দুঃখিতভাবে বলে, ওটাই একটা দুশ্চিন্তার কথা। বুঝলেন ? আমাদের মধ্যে কিছু লোকের ভুলের জন্য উদ্যোগটা কিছু পরিমাণে রাজনীতিকদের হাতে চলে গেছে। সব থেকে বড়ো ব্লাণ্ডার কী হয়েছে জানেন ? আগে সরকারের পুরো কাজটাই ছিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন—শাসন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষা। আর এখন সব-কিছুর উপরে হ'ল ডেভেলপমেন্ট—উন্নয়ন! পুলিশকেও নাকি ডেভেলপমেন্ট ওরিয়েন্টেড আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। হাঃ! কিন্তু হাল ছাড়বেন না মিস্টার মিত্র। এভাবে চলে না। আমার বিশ্বাস, যে দাপট আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে, অচিরেই আমরা আবার তা ফিরে পাব।

সুদীপ বলে, আপনি তো চা খান না, কীভাবে আপনাকে আপ্যায়ন করব ?

মন্মথ বলে, নেভার মাইণ্ড। আপনাদের সঙ্গে কথা বলেই আমি খুব আপ্যায়িত বোধ করছি। আসলে আমি এসেছিলাম বড়ো সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। শুনলাম তিনি বাইরে গেছেন, তাই

আপনার ঘরে ঢুঁ মেরে গেলাম। আচ্ছা, আজ তবে উঠি ?

মন্মথ দু'জনের কাছ থেকেই বিদায় নিয়ে বেরিয়ে যায়। তার পায়ের শব্দ নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছোলে অশোক বলে, এরকম একটা নিরেট আহাম্মকের সঙ্গে কথা বল কী করে ?

সুদীপ বলে, নিরেট আহাম্মক! তুই তো অবাক করলি? পশ্চিমবঙ্গের অন্তত গোটা আষ্টেক থানায় মন্মথ দারোগা বাঘ আর গোরুকে এক ঘাটে জল খাইয়েছে, তা জানিস ? মন্মথকে তোর যত অপছন্দই লাগুক, কথাগুলোর মধ্যে অনেক সত্যও আছে। মন্মথ তোকে তবু একটা নির্দিষ্ট লাইন দিতে পেরেছে, আমি কিন্তু তা পারিনি। আমার আর তোর কোনো চরিত্র নেই, মানুষ আমাদের চিনতে পারে না। কিন্তু মন্মথর এ দোষ নেই।

অশোক বলে, ডি এম নেই বলে গেল ? নেই নাকি ?

সুদীপ বলে, ডি এম-কে আজ পাবি না। দেখা করতে হলে আজ থেকে যা। কাল দেখা করে ফিরে যাবি।

অশোক বলে—না, আজই ফিরে যাব। যে কারণে চাইছিলাম, তা তো হয়েই গেল। বুঝলাম যে ডি এম চায় টুপিটা আমিই পরি। এ বিষয়ে আর কথা বলতে গিয়ে লাভ কী? বরং অন্য একটা ব্যাপার আছে। আমার এস এ ই-কে ট্রান্সফার করাতে হবে। এটা পারবে কিনা দেখো।

সুদীপ বলে, তোর এস এ ই—মানে সেই পরিমল ? সে শালা তো চোর। কী একটা ব্যাপারে যেন গতবছর আমার কাছে এসেছিল একবার। আমি তখনই ধরেছিলাম।

অশোক বলে, চোর তো বটেই, ধরাও পড়েছে। এই পুরো রিপোর্ট ডি এম-কে দিয়ে যদি ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করতে পার ভালো, নাহলে পানজোড়ায় আমার সামান্য অথরিটিও থাকবে না। আর অফিসে যদি অথরিটি না থাকে, তবে সেখানে কাজ করা দূরের কথা, থাকাও সম্ভব হবে না।

সুদীপ দ্রুত রিপোর্টটার উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। বলে, এটা ডি এম-কে দিয়ে করিয়ে নিতে পারব। কিন্তু একথা কি ডি এম-কে বলব যে এর সঙ্গে ডেভেলপমেন্টের কাজের সম্পর্ক আছে?

দু'জনে চোখোচোখি হয়।

অশোক বলে, মানে তুমি কি এটার পরিবর্তে একটা শর্ত—

সুদীপ বলে, আমি নয়। ডি এম করতে পারে যতটুকু লোকটাকে বুঝেছি।

অশোক কী উত্তর দেবে বুঝতে পারে না। শেষে বলে—জানি না, যা খুশি বোলো। আমি এই অসহ্য লোকটার হাত থেকে রেহাই চাই। সুদীপ বলে, বেশ। আরেকটা কথা তোকে বলি। তুই নিশ্চয়ই ভুলে যাসনি যে, জেলার প্ল্যানিং অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্টের দায়িত্বও আমার ঘাড়ে? কাজেই এর পরের বার এ নিয়ে কিছু অফিসিয়াল হিসাব-নিকাশ কিন্তু তোর কাছে চাইব।

সদর থেকে ফিরে আসার ষষ্ঠ দিনে অশোকের আকাঙ্ক্ষিত 'গোপনীয়' খামটি সদর থেকে বিশেষ পত্রবাহক নিয়ে আসে। জেলাশাসক পরিমলকে বদলি করেছে এবং বদলির আদেশ পাওয়ার তিনদিনের মধ্যে নতুন ব্লকে যোগদান করার নির্দেশ দিয়েছে।

চিঠিটা হাতে পেয়ে সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভাবে, এবার কী? পরিমলের মতো একটা ঘৃণ্য মানুষের সাথে দ্বৈরথে সে জিতেছে, এই আত্মপ্রসাদ কিন্তু বেশিক্ষণ তার থাকে না। চিঠিটা হাতে নিয়ে কিছু সময় পরেই তার মনে হয়, সত্যিই কি সে প্রতিশোধপরায়ণ নয়? সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, কী দরকার ছিল একটা সংসারি মানুষকে তড়িঘড়ি বদলি করবার? এতে কি সে সত্যিই কোনো পরিবর্তন আনতে পারবে? অথবা পরিবর্তন করার সঙ্গতি বা ইচ্ছাও কি তার আছে?

দীর্ঘসময় বিষয়টা নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করার পর সে

শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত হ'ল যে তার রুষ্ট অভিমানকে তৃপ্ত করা ছাড়া এই সম্পূর্ণ বিষয়টার পিছনে কোনো মহৎ কারণ খুঁজতে যাওয়া আত্ম-প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যায়, অবিচার, অসততা এবং প্রবঞ্চনা নিজে সে করে না, সমর্থনও করে না। কিন্তু এ-সবের বিরুদ্ধে রীতিমতো ধর্মযুদ্ধ শুরু করার মতো মানসিক গঠনও তার নয়।

তবুও তার অভ্যন্তরের অন্য যুক্তিটি, যেটি সর্বদাই অপ্রধান, এই মুহূর্তে তার বক্তব্য জোরদার করে। সে ভাবে, ধর্মযুদ্ধ করতে না পারলেও প্রতিবাদ করা উচিত এবং ক্ষমতা থাকলে প্রতিহত করা উচিত।

ফলে প্রথম সত্তা 'ক্ষমতা থাকলে' কথাটাকে নিয়ে কৌতুক ও শ্লেষ সৃষ্টি করে। তাতে প্রমাণ হয়, অন্যায়ের প্রতিবাদ করাটা তার চরিত্রের মুখ্য বিবেচ্য বিষয় নয়। ব্যাপারটা আপেক্ষিক, 'ক্ষমতা থাকলে'-র উপর নির্ভরশীল। না থাকলে তা অর্জনের দিকে সে কি কখনো ধাবিত হবে ?

এইসব সাত-পাঁচ চিন্তায় সে খুব বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তারপর চিঠিখানা পকেটে ফেলে সে টের পায় যে তার চোয়াল বেশ শক্ত হয়ে আছে। নেশা করলে মাথার ভেতরে যেমন একটা দাম্ভিক তাচ্ছিল্য আসে, অশোক নিজেকে তেমনি তরল দেখে। ক্ষমতা, তাকে খুব সামান্য হলেও, নেশাগ্রস্ত করেছে। নিজের ঘর থেকে সে যখন বেরিয়ে আসে তখন চারটে বাজে। অফিস সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত। ঘরে টাইপিস্ট মহিলা ছাড়া আর কেউ নেই। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় রাস্তার চায়ের দোকানে সে অফিসের কয়েকজনকে দেখতে পায়। আবহাওয়া বেশ থমথমে লাগে তার। সে একটু অবাক হয়। এ কি শুধু তার নিজের ভিতরের চিন্তার প্রতিফলন ?

সাড়ে পাঁচটার পরে পরিমল যখন তার ঘরে ঢোকে তখনি অশোক বুঝতে পারে থমথমে ভাবটা নিজস্ব চিন্তার প্রতিফলনই শুধু নয়, পরিমলের মুখ ভারী এবং একরোখা বিপজ্জনক। সে কথা বলে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে।

—আমি একটা ছুটির দরখাস্ত এনেছিলাম। দিন-দশেক ছুটির দরকার আমার।

—কবে থেকে?

—আগামীকাল থেকে।

—হঠাৎ?

—হঠাৎই। বাড়ি থেকে একটা খবর এসেছে, মা খুব অসুস্থ। আমাকে যেতেই হবে।

পরিমলের চোখেমুখে অস্বস্তি আছে, কিন্তু সেটা তার মিথ্যা কথা বলার জন্য নয়, অশোক নিঃসন্দেহে এ কথা জানে।

—হঠাৎ খবর পেলেন? টেলিগ্রাম এসেছে নাকি?

—হ্যাঁ, দেখবেন?

অশোক কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে যে 'দেখবেন?' এই চ্যালেঞ্জের কথাটা ছুঁড়ে দেবার পর পরিমল কি সুতোর উপরে ঝুলছে? সে কি দেখতে চাইবে? সেই তরল নেশা তার মস্তিষ্কে এখনো ভারী। তার বড়ো লোভ হয়। দেখতে চাইলেই পরিমলের দম্ভের বেলুনে পিন ফোটানো হবে, তখন পরিমলকে কোনো ঘোরালো রাস্তা নিতে হবে প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্য। খুব সম্ভবত সেক্ষেত্রে সে ঠ্যাটামি করে একটা বেপরোয়া উত্তর দেবে। কিন্তু তখন নিয়ন্ত্রণ অশোকের হাতের বাইরে চলে যাবে। এই মুহূর্তে সে পরিমলকে নিজের থেকে জানাতে চাচ্ছে না তার বদলির খবর। কাল অফিসে নিয়মমাফিক চিঠিখানা সে পরিমলকে ধরাবে, এরকম পরিকল্পনা তার আছে। কাজেই এখন অশোকই বরং বিব্রত একথা ভেবে যে কীভাবে পরিমলের আকস্মিক ছুটির প্রার্থনা এড়ানো যায়। মানুষের সঙ্গে বিরোধে একটা বড়ো অশান্তি আছে। বিরোধে হারলে তো বটেই, ইদানীং অশোক খুব আশ্চর্য হয়ে দেখছে, জিতলেও। কী এক ক্লিন্ন অশান্তি তারপর দীর্ঘ সময় ধরে কুরে কুরে খায় তাকে। অনরবত অসহিষ্ণু মানুষ সেইসঙ্গে আমিও! অনবরত নিষ্পত্তিহীন যুযুধান। যদি আমি জিতি, তাহলেও।

পিছন ঘুরবার আগেই জয়ের উত্তেজনা বিরক্তিতে গ্রাস করে। সেই যেমন একবার স্নানের ঘরে হাত থেকে ঘড়িটা খুলে রাখতে গিয়ে অসাবধানে পায়খানার মধ্যে পড়ে যায়। দু-এক মুহূর্ত চিন্তা করে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে ঘড়িটা বের করে এনেছিল সে। পুনঃপ্রাপ্তির তৃপ্তির থেকে সারাদিন ধরে গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করার অনুভূতিটাই তাকে পীড়া দিয়েছিল বেশি। তারপর সে দেখেছে, এই তৃপ্তিটাই অলীক। আসলে এ কোনো পাওয়াই নয়। যা তার ছিল তাই তার আছে। তাই নোংরায় হাত দেওয়ার অনুভূতিটাই একমাত্র সত্য হয়ে থাকে। সেটাই একমাত্র সত্য যে। সে এখন দ্যূতসভার শকুনির মতো নিঃশঙ্ক, তবুও জয়ের গ্লানি আগাম তাকে পীড়িত করে।

—না, দেখতে চাই না, আপনার কথাই যথেষ্ট। (আপনি তো একজন দায়িত্বশীল অফিসার) তবে ছুটি তো আপনি এখন পাবেন না। ছুটি এখন আপনাকে আমি দিতে পারব না।

দুর্দম বেগে সেই অশান্তি আসছে, সেই জয় অথবা পরাজয়ের অশান্তি। অসহিষ্ণু বাদ-প্রতিবাদ, অনভিপ্রেত রেষারেষি।

—আমার মা মৃত্যুশয্যায়, তবুও না?

—না, তবুও না। আপনি এখন আসুন। কাল এ নিয়ে অফিসে কথা বলবেন।

--দাঁড়ান বি ডি ও সাহেব। আপনি ছুটি না দিলেও দরখাস্ত বড়োবাবুকে দিয়ে রিসিভ করিয়ে আজই আমি চলে যাব। আটকাতে আপনি পারবেন না।

—আটকাতে আপনাকে আমি চাই, একথা মনে করলেন কী করে? আপনার ট্রান্সফার অর্ডার এসেছে। সেটা রিসিভ করে যেখানে খুশি আপনি যেতে পারেন। দরকার হয়, আমিই ব্যবস্থা করে দেব।

পরিমল খানিকক্ষণ দম ধরে থাকে। খবর তার কাছে দু'দিন আগেই এসেছে। সু এবং কু, এই দুই খবরই একেবারে নিঃসংশয় না হওয়া পর্যন্ত গ্রহণ করতে ইচ্ছা হয় না। সদরের পত্রবাহক গোপন

খাম নিয়ে ব্লকে আসাতে পরিমল আজ নিঃসংশয় হয়েছে। এখন অশোকের মুখে শোনার পর সে তার প্রতিরোধ প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে। এ ব্লকে সে স্বচ্ছন্দে আছে। বে-আইনি রোজগারের জন্য যে সংগঠন তৈরি করতে হয়, সে সংগঠন এখানে সে ভালোভাবেই তৈরি করেছে। পঞ্চায়েতের সঙ্গে সম্পর্ক তার খুবই ভালো। কেননা পঞ্চায়েত সভাপতি নিজেই অসৎ রোজগারে উৎসাহী। নতুন জায়গায় নতুন সভাপতি এরকম নাও হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, এভাবে আচমকা বদলি একরকম শাস্তি হিসাবে গণ্য হয়। অবশ্যই এর পেছনে বি ডি ও-এর রিপোর্ট আছে। সুতরাং বিষয়টার মূলোচ্ছেদ এখনি না করতে পারলে, ভবিষ্যতে চাকরি-ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি হবে। তাছাড়া, সবার উপরে আছে পরাজয়ের গ্লানি। কেননা জয়ের গ্লানি সবাই টের পায় না। এ-সব পরামর্শ সে তার সহকর্মীদের সঙ্গে করেছে। সে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত এবং সমিতিও তাকে সমর্থন করবে—এরকম প্রতিশ্রুতি আছে।

—চিঠিটা আপনি এখনি রিসিভ করতে পারেন, চার্জ বুঝিয়ে দেবার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না।

পরিমল নিশ্চয়ই এমন বোকামি করবে না। চার্জ বুঝিয়ে দেওয়ার ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পেলে অনেকেই সন্তুষ্ট হবে, পরিমল নয়। কাগজপত্র অনেককিছুই বেকায়দায় আছে। এখান থেকে সরে যেতে হলে, শুধু নিজেকে বাঁচাবার জন্য কিছু সময় দরকার—যাতে সব মোটামুটি গোছগাছ করে রেখে যাওয়া যায়। কিন্তু সে-সব তো পরের কথা।

—বাড়ি থেকে ঘুরে না এসে চিঠি রিসিভ করতে পারব না বি ডি ও সাহেব।

—বাড়ি কী করে যাবেন? আমি তো আপনাকে ছুটি দিচ্ছি না। স্টেশন লিভের অনুমতিও দেব না।

—আপনার হাতে ক্ষমতা আছে, আপনি যা খুশি তাই করতে

পারেন। কিন্তু তাতে আমার যাওয়া আটকাতে পারবেন না।

—তাহলে আর আমার কাছে এসেছেন কেন? নিজেই ঠিক করে নিন কী করবেন।

নেহাত হাত ধরে বের করে দেওয়া যায় না, তাই অশোক ভিতরের ঘরের দরজার দিকে এগোয়। দরজা পেরিয়ে ভিতরের ঘরে যায় সে এবং পিছনে না তাকিয়েও বুঝতে পারে পরিমল এখনো দাঁড়িয়ে আছে।

ভিতরের ঘরে এসে অশোক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। খানিকক্ষণের স্তব্ধতা। হঠাৎ পরিমল গলার স্বর অসম্ভব চড়িয়ে চেঁচায়।

—আচ্ছা, আমিও দেখব আপনার অফিসারির মুরোদ কতখানি—

অশোক অত্যন্ত দ্রুত ভেতরের ঘর থেকে বাইরের ঘরে আসে। পরিমলের অসংস্কৃত কণ্ঠস্বরের বিকৃতি তাকে ক্রুদ্ধ করে। তাছাড়া শারীরিক সামর্থ্যে সে পরিমলের থেকে অনেক ক্ষমতাশালী। তার ভঙ্গি অবশ্যই মারমুখী।

পরিমল সামান্য সন্ত্রস্ত হয়ে ঘরের বাইরে, সেখান থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি পার হয়ে রাস্তায়।

—দেখবেন? মুরোদ? আসুন, এখুনি দেখিয়ে দিচ্ছি!

তার উত্তোলিত মুষ্টি যথেষ্ট শক্তিশালী।

পরিমল আর দাঁড়ায় না। সে আরো কী-সব বলে, বলতে বলতে চলে যায়—যা অশোকের কান পর্যন্ত পৌছোয় না। ঘরে ঢুকে পড়ার আগেই সে টের পায় অন্তত তিন-চারজন মানুষ পরিমল ও তার ভেতরের এই নোংরা কলহ প্রত্যক্ষ করেছে। সঙ্গে সঙ্গেই সেই গ্লানি চেপে বসতে থাকে তার উপর। অসহ্য বিরক্তি ক্রমশ। শেষপর্যন্ত আক্ষেপ ও হতাশা। শরীর অবসন্ন লাগতে থাকে তার। সে তক্তপোশের বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে।

পরদিন পরিমলকে অফিসে পাওয়া যায় না। খোঁজ নিয়ে জানা

যায়, বি ডি ও-র অনুমতির তোয়াক্কা না করে সে সত্যিই চলে গেছে।

অশোক অক্ষম ক্রোধে নিজের মনেই কয়েকবার 'আচ্ছা — আচ্ছা' বলে। তারপর বড়োবাবুকে ডেকে পরিমলের বাড়ির ঠিকানার খোঁজ করে। বাড়ির ঠিকানা কেউ জানে না।

তখন শুরু হয় ব্যক্তিগত ফাইল খোঁজা। অনেক খুঁজে পরিমলের বাড়ির ঠিকানা পাওয়া যায়। পাশের জেলার সদর শহরে পরিমলের বাড়ি। অশোক রেজেস্ট্রি ডাকে পরিমলের বদলির আদেশ পাঠিয়ে দিল।

আরেকটি দরকারী কাজ সেদিন করে অশোক। তা হ'ল, পঞ্চায়েত সমিতির মিটিং-এর নোটিস জারি করা। নোটিস-বইতে সদস্যদের সই করানো একটা ঝামেলার কাজ। বারবার পিওন পাঠিয়ে এ কাজ করতে হয়। সবাইকে সময়মতো পাওয়া যায় না। এবারে অনেককেই পাওয়া গেল না, এমন-কি সভাপতিকেও নয়। নিয়মমাফিক সমিতির অফিসের বোর্ডে নোটিস টাঙিয়ে রাখা হ'ল। মিটিং-এর তারিখ সাতদিন পরের।

সমস্ত অফিস একটা অদ্ভুত কর্মহীনতায় ভুগছে। অথচ সবাই জানে ব্লকের কাজের অন্ত নেই। কত যে বিচিত্র রকমের কাজ এবং কত বিভিন্ন ধরনের এক্সটেনসন অফিসার এই বি ডি ও নামক বট-বৃক্ষের ছত্রছায়ায়, তার পুরো হদিস অশোক এখন পর্যন্ত পায়নি। সবাইকে সে চেনেও না। কারণ বহু লোক অফিসের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে সামান্যই। একজন সমবায় পরিদর্শক আছে, অশোক তাকে মাসে একবার কি দু'বার দেখে। বি ডি ও-র তত্ত্বাবধানে এরকম আছে ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগঠন, আদিবাসী ও তফশীলি জাতি উন্নয়ন পরিদর্শক, যুবকল্যাণ, মৎস্যচাষ ইত্যাদির এক্সটেনসন অফিসার, মজুরী পরিদর্শক এবং প্রতি অঞ্চলের জন্য একজন করে গ্রামসেবক। ব্লক অফিসে এদের অধিকাংশেরই একখানা করে চেয়ার টেবিলের সংস্থানও

নেই। অশোক জানে না এরা সারা মাস কী করে।

সুদীপের সঙ্গে তার যে-সব কথা হয়েছিল, সে-সব নিয়ে একা যখন সে চিন্তা করেছে, তখন আরো দিশেহারা হয়ে গেছে। সুদীপকে তার মনে হয়েছে আরো হতাশ, আরো বিমূঢ়। কিছু করার নেই, সবই ভস্মে ঘি ঢালা, এই বোধ নিয়ে চাকরি করার থেকে অল্পবুদ্ধির সাধারণের মতো বিশ্বাস নিয়ে কাজের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা অনেক স্বস্তির, একথা এখন সে ভালো করে বোঝে। কিন্তু তা আর হওয়ার উপায় নেই।

বিকেলের দিকে গোপেশ সরকার নামে একজন কর্মচারী এসে জানালো, আগামীকাল সরকারি কর্মচারীদের তরফ থেকে একটা ডেপুটেশন দেওয়া হবে, বি ডি ও সাহেবকে একটু সময় দিতে হবে।

—ডেপুটেশন ?

অশোক একটু বিস্মিত হয়। নিজেকে বিপদগ্রস্ত দেখার যতগুলো সম্ভাব্য ছবি সে মনে মনে প্রস্তুত করেছে, ডেপুটেশন তার বাইরে ছিল।

—ডেপুটেশন কিসের জন্য ?

—কর্মচারীদের কিছু দাবি-দাওয়া এবং বক্তব্য আছে।

—দাবি-দাওয়া আমার কাছে ?

অশোক আরো বিস্মিত হয়। সরকারি কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া মেটাবার মতো এমন-কি তা শোনার মতো যোগ্যতা বি ডি ও হিসাবে তার আছে কি না, সে জানত না। তবে সে জানত যে ডেপুটেশন একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এবং সরকারি অফিসারকে তা গ্রহণ করতে হয়।

পরদিন সেই ডেপুটেশন হয় টিফিনের সময়—প্রথমে বাইরে কিছু সময় স্লোগান হয়। স্লোগানের বক্তব্য—উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে, আই আর ডি পি ইত্যাদি দ্রুত কার্যকরী করতে হবে, আমলাতন্ত্রকে নিপাত যেতে হবে, শাস্তিমূলক বদলি চলবে না, সরকারি সম্পত্তির অপচয় বন্ধ করতে হবে, ইত্যাদি।

স্লোগান শুনে অশোক মোটামুটি আঁচ করতে পারে ডেপুটেশনের আক্রমণটা কোন্ দিক দিয়ে হবে, কিন্তু পুরোপুরি বোঝা তার সাধ্যের মধ্যে ছিল না।

পাঁচজন কর্মচারী গোপেশের নেতৃত্বে ভিতরে এসে চেয়ার দখল করে। মামুলি কথা শুরু হয় সার্বিক গ্রামোন্নয়ন নিয়ে, যাতে গরীব কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের উন্নয়নে ব্লকের দারুণ ব্যর্থতায় ভীষণ উদ্‌বেগ প্রকাশ করা হয়। এজন্য দায়ী করা হয় বি ডি ও-কে। কেননা তারই অপদার্থতায় ব্লকের যাবতীয় কাজকর্ম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। অবিলম্বে এ-সব আবার চালু করতে হবে।

অশোক ঠিক করে রেখেছিল যে, তর্ক বাড়তে পারে এমন কোনো মন্তব্য সে ভুলক্রমেও করবে না এবং ডেপুটেশনের লিখিত বক্তব্য এস ডি ও-র কাছে পাঠিয়ে দেবার অঙ্গীকার ও ব্যবস্থা সে করবে।

কিন্তু বিষয়টা তত সরল থাকে না। মামুলি প্রসঙ্গ দ্রুত শেষ ক'রে কর্মচারীরা তীব্রভাবে আক্রমণ করে তার আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির কাজকর্ম এবং পরিমলের বদলির বিষয় নিয়ে।

অশোককে কথা বলতেই হয়। সে বলে, পরিমলবাবুকে বদলি করেছেন ডি এম। তাতে আমার কী করার ছিল?

—আপনার রিপোর্টেই ব্যাপারটা হয়েছে, কাজেই বদলির আদেশ রদ করার ব্যবস্থাও আপনাকে করতে হবে।

—আমি আপনাদের বক্তব্য উপরে জানিয়ে দেব। বদলি যেমন আমি করতে পারি না, সে আদেশ রদ করার ক্ষমতাও আমার নেই।

—আপনাকে রিপোর্ট উইথড্র করতে হবে লিখিতভাবে, আর যা করবার আমরাই করব।

—এ সম্বন্ধে আপনাদের আমি কোনো আশ্বাস দিতে পারব না, অন্য প্রসঙ্গ তুলুন।

এই পয়েন্টেই আপনাকে কথা বলতে হবে। এটার ফয়সালা না হলে অন্য কথা বলা যাবে না।

—মাথা গরম করে কিংবা মেজাজ দেখিয়ে আমাকে দিয়ে নতুন কথা বলাতে পারবেন না। অন্য কী কথা আছে বলুন।

উচ্ছৃঙ্খল চিৎকার চেঁচামেচি, খানিকক্ষণ নিজেদের মধ্যে তারা নানারকমের বাদ-বিতণ্ডা করে যার তীক্ষ্ণ মন্তব্যগুলো অবশ্যই বি ডি ও-র উদ্দেশে।

অশোক অপেক্ষা করে।

তারপর পাঁচজনের একজন আচমকা একটা অদ্ভুত কথা বলে।

—ব্লকে সরকারি অর্থের নয়ছয় হচ্ছে।

—হচ্ছেই তো।

—সেগুলো বন্ধ করতে হবে।

অশোক যেন মজা পায়।

—অবশ্যই হবে। আপনারা আমার সঙ্গে সহযোগিতা করুন, তাহলে সবাই মিলে এ-সব বন্ধ করতে পারব।

—আগে আপনার নিজের অন্যায় সুযোগ-সুবিধা নেওয়া বন্ধ করুন।

অশোক কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে।

—আমার কী অন্যায় সুযোগ-সুবিধা?

—আপনি যে বাসায় ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করেন তার বিল দেন?

অশোক আচমকা আঘাতে হতবাক হয়। তার সুদীপের কথা মনে পড়ে।

—আ-মা-র ইলেকট্রিসিটি বিল!

—হ্যাঁ! খুব যেন অবাক হচ্ছেন? সরকারি অফিসারদের ইলেকট্রিসিটি ফ্রি নাকি? আপনার বাসায় আলো জ্বলে না? ফ্যান চলে না?

—সে বিল কি আমার বাড়ি ভাড়ার সঙ্গে যুক্ত নয়?

নিজেদের মধ্যে কিছু স্থূল ব্যঙ্গ, ইঙ্গিতে পরিহাস। কিন্তু গোপেশের ধারণা সে খুব দক্ষ ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী এবং দুঃসাহসী বক্তা।

সে বলে, ন্যাকা সাজছেন কেন? বাড়িওয়ালা আপনাকে যে রসিদ দেয় তা আপনি খুলে দেখেন না?

অশোকের কোনো উত্তর নেই। উত্তর দেওয়ার চেষ্টাও সে করে না। মাথা নিচু করে থাকে।

গোপেশ তাতে আরো উৎসাহ বোধ করে। বলে, দয়া করে মাথা তুলে একবার দেখুন, আপনার মাথার পেছনে বাঁদিকে মেইন সুইচ আর মিটার আছে। আর ঐ যে দেয়াল ফুটো করে ইলেকট্রিকের তার ও পাশে গিয়েছে। আর সেখান থেকে পনরো হাত লম্বা রবারের পাইপের ভেতর দিয়ে লাইন আপনার ঘরে গেছে। মনে হচ্ছে, যেন এ-সব এতদিন আপনার নজরে পড়েনি!

নজরে পড়েছে ঠিকই এবং খেয়াল হয়নি এও ঠিক। কিন্তু এখানে কেউ এ কথা বিশ্বাস করলেও, অবিশ্বাসের একটা হাসির হুল্লোড় উঠবে, এতে সন্দেহ নেই। হৃদয়হীনতার প্রতিযোগিতায় একে অন্যের উপরে টেক্কা দিতে চায় চরম অশালীন হয়ে।

কোণঠাসা হয়ে অশোক ঘুরে দাঁড়াবার একটা রাস্তা পায়। নিচু মুখ উঁচু করে বলে, অপচয়ের এই ফুটোটা আপনাদের নজরে পড়েছে কবে?

—কেন গোড়া থেকেই।

—গোড়া থেকে মানে? আমি আসার পর থেকেই? মানে মাস চারেক ধরে তো?

—না, মানে···তা কেন?

—এ ব্লকের বয়েস কত বড়োবাবু?

—তা পঁচিশ বছর হবে।

—প্রথম থেকেই এই বাড়িতে অফিস ছিল?

—হ্যাঁ, প্রথম থেকেই। তাতে কী?

—প্রথম থেকেই ইলেকট্রিসিটি ছিল?

—তা বলতে পারব না।

—আপনি ক'দিন আছেন এ ব্লকে ?

—তা বছর দশেক হবে।

—বছর দশেক তো ইলেকট্রিসিটি আছে ?

—হ্যাঁ, তা আছে।

হঠাৎ গোপেশ কথার মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বলে, এ-সব কথার মানে কী ?

—মানে এই, এই দশবছরে সরকারি টাকার নয়ছয় আপনাদের কারো চোখে পড়েনি, আজ হঠাৎ পড়ল কেন ?

একটু অস্বস্তি, একটু আশাহত প্রতিপক্ষ, একটু যেন সংকোচ। কিন্তু স্লোগান ছিল—এ লড়াই বাঁচার লড়াই—এ লড়াই জিততে হবে। সুতরাং গোপেশ হারবে না। আর বি ডি ও এখন সমিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলছে, সুতরাং উপরওয়ালার সম্মান আর তার প্রাপ্য নয়। ভদ্রতাও নয়।

গোপেশ বলে, এ-সব বাজে যুক্তি দিয়ে মশাই আপনি নিজের পাপ ঢাকতে চাইছেন। দশবছর ধরে গভর্নমেন্টের টাকায় ইলেকট্রিকের বিল আমরা দিইনি, আপনারা দিয়েছেন—আপনারা, বি ডি ও-রা।

—ঠিক আছে। ইলেকট্রিকের লাইন আমি আজই কাটার ব্যবস্থা করছি। আর কী বক্তব্য আছে আপনাদের ?

—আর কোনো বক্তব্য নেই। আমাদের লিখিত বক্তব্য এই নিন। এস ডি ও-র কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আরেকটা কথা—পরিমলবাবুর বদলির বিষয়টা চিন্তা করে দেখবেন, নাহলে অফিসের কাজকর্ম সব বানচাল হয়ে যাবে।

উত্তেজিত এবং সাফল্যের আনন্দে উদ্‌বেল পাঁচজন সদম্ভে বেরিয়ে যায়। দরজা দিয়ে বেরোবার আগে গোপেশ তার সঙ্গীদের কাছে নিজেকে আর একবার জাহির করে। বলে, নিজে যদি এই ডেপুটেশন সম্পর্কে রিপোর্ট করেন, তবে আশা করি ইলেকট্রিসিটির কথাটা বাদ দেবেন না।

অশোক সজোরে বলে, নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

বাইরে থেকে কেউ একজন বলে—আরে কাকে কি কাকের মাংস খায়?

যদি সুদীপ এখানে থাকত তবে বলত, কথাগুলো যত অপ্রিয়ই হোক, সত্যি তো!

উত্তরের এই জেলাগুলোয় সন্ধ্যার পরে হিম পড়ে বড়ো বেশি। কার্তিক মাস থেকে ফাল্গুন-চৈত্র মাস পর্যন্ত হিম পড়ে। এখন এই কার্তিক মাসেই কোনো কোনো দিন আবহাওয়া বেশ সিরসিরে, অনুভূতি বিষণ্ন, বিকেলের আলো বড়ো তাড়াতাড়ি ম্লান, ফলে সেই ক্রমাগত পিছনে ফিরে যাবার আকুলতা অশোকের।

সন্ধ্যার সময় সে রাস্তায় বের হয়। চার-পাঁচদিন ইরাবতীর সঙ্গে তার দেখা হয়নি। এইভাবে চার-পাঁচদিন ধরে সে নিজেকে সংযত রাখে। এভাবে মানুষের দৃষ্টি এবং জিহ্বাকে সংযত রাখার চেষ্টা। আজ সে ভেবেছিল যাবে। এই যাওয়ার একটা মানসিক প্রস্তুতি সারাদিন ধরে তার ভেতরে উত্তেজনা সঞ্চার করেছে। একটা প্রাপ্তির সম্ভাবনা, যা সে পাবেই অর্থাৎ ইরাবতীর সান্নিধ্য, তাকে বড়ো বেশি ভরপুর করে রাখে।

কিন্তু দুপুরের ঘটনা তাকে বিক্ষিপ্ত এবং বিধ্বস্ত করে দিয়ে গেছে। নিজেকে এত মলিন এবং মূল্যলীন আর কখনো মনে হয়নি। এভাবে ইরাবতীর কাছে যাওয়ায় কোনো অর্থই আর সে খুঁজে পায় না। এই সময় সে নিজেকে দেখাতে চায় না কারো কাছে, বিশেষ করে ইরাবতীর কাছে! এরকম হয়, যখন মানুষ নিজেকে নিজেই করুণা করে।

পানজোড়ায় দু'কিলোমিটার মোট পাকা রাস্তা। অশোক সেই পাকা রাস্তা এড়িয়ে কাঁচা রাস্তায় নামে। দক্ষিণ দিকে একটা ছোটো নদী আছে। উত্তরের সব নদীর মতো বর্ষায় ভয়ানক বেগবান। বর্ষা

যেতে-না-যেতেই চওড়া বালিয়াড়ির মাঝখানে ক্ষীণস্রোতা। পানজোড়াকে বন্যার হাতে থেকে বাঁচাবার জন্য নদীর উত্তর পাড়ে মাইলখানেক উঁচু বাঁধ দেওয়া আছে। সেখানে মৎস্যজীবী হালদারদের পাড়া। জায়গাটা নির্জন এবং যেহেতু পানজোড়ার নদীতীরে ভ্রমণের মানুষ বিরল, খুব দরকার না পড়লে সেখানে কেউ যায় না।

অশোক বাঁধের উপর দিয়ে হাঁটতে থাকে। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। সে হাঁটছিল পশ্চিম থেকে পুবে। নদী তার ডান হাতে। বাঁ দিকে বাঁধের ধার ঘেঁষে হালদারদের সারি সারি কুঁড়ে ঘর। সেখানে লম্ফের আলোয় করুণ ঘরকন্নার চিহ্ন। করুণ কিন্তু পরিচিত। ক্ষুধার্ত শিশুদের ঘ্যানঘ্যানানিতে বিরক্ত মা, দাওয়ার বাঁশে হেলান দিয়ে বসে থাকা অলস পুরুষ, উঠোনের একপাশে কাঠকুটো জ্বালিয়ে কালো মাটির হাঁড়িতে ভাত ফুটোচ্ছে কোনো মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক, প্রকাশ্যেই কাপড় পাল্টে পরছে এমন কোনো যুবতী, তার পাশেই তাসের টোয়েন্টিনাইন খেলার একটা দঙ্গল, দাওয়ার আড়ায় দড়ি বেঁধে জাল বুনে চলেছে অনেক ঘরেই ইত্যাদি। এই জাল-বুনিয়েদের মধ্যে একজনকে খুব চোখে লাগে অশোকের। সে বয়সে প্রাচীন। গায়ের রঙ ঘন কালো, লম্বা এবং মেদহীন তার চেহারা। অশোকের নজরে লাগে এই কারণেই যে লোকটির চুল এবং দাড়ি বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের মতো। হাতের সঙ্গে সঙ্গে মুখও নড়ছে অবিরাম। কিন্তু দূর থেকে অশোক সে-সব কথা শুনতে পাচ্ছিল না।

কয়েক পা এগিয়ে অশোক নীচের দিকে সটান নেমে যাওয়া একটা সিঁড়ি পায়। সে টর্চ ফেলে সিঁড়ির শেষ ধাপ পর্যন্ত দেখে। প্রায় সত্তর-আশিটা ধাপ ঈষৎ তির্যক হয়ে সটান নেমে নীচের বালিয়াড়িতে গিয়ে মিশেছে। কয়েক ধাপ নেমে অশোক একপাশে বসে পড়ে। সামনে অন্ধকারের মধ্যে কোথাও নদী আছে। আছে সে জানে। ষাট, সত্তর, হতে পারে একশো ধাপ সিঁড়ি, তারপরে দেড়শো-দু'শো হাত নদীগর্ভের বালি, তারও পরে নদী। এই

হিসাবের বেশি কিংবা কমও হতে পারে। সে শুধু জানে অন্ধকারের ভেতরে কোথাও নদী আছে। যেহেতু এখন সে নদীর দিকে মুখ করে বসে আছে, সুতরাং নদী তার সামনে। সে যদি এখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়, বালিয়াড়ির মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায়, তারপর শিশু-বয়সের মতো পায়ের গোড়ালিতে ভর করে বন্‌বন্‌ করে কয়েক পাক ঘোরে, তখন সে কোথায় আবিষ্কার করবে নিজেকে? তার কোন্‌দিকে তখন নদী থাকবে? ঘন নিরেট অন্ধকারে সে তখন কিছুই দেখতে পাবে না। সে নদীকে হারিয়ে ফেলবে, কিন্তু জানবে আশপাশে কোথাও নদী আছে। তার একবার ইচ্ছা হ'ল, নদীর কাছে গিয়ে হাত দিয়ে জল ছুঁয়ে শরীরে জলের অনুভূতি নেয়। কিন্তু সে ওঠে না। এখানে সে দিব্যি বসে আছে। সামনের সিঁড়ির ধাপ বড়ো অনির্দিষ্ট, ভাঙাচোরা। নদীর কাছে যেতে তার আলস্য লাগে, ভয় লাগে।

তখন পিছনে কেউ শ্লেষ্মা জড়ানো গলায় কাশে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে, থামে এবং প্রশ্ন করে, ওঠি কে বইসে? অ্যাঁ? অন্ধকারে?

অশোক বলে, আমি।

আগন্তুক বলে, ছুনিয়াৎ বেবাক্ মান্‌ষে 'আমি'। কেও 'তুমি' লয়। হুস্‌স্ শালো, নিভে গেল! শলাই আছে?

অশোক টর্চ জ্বালে। সে এখনো মানুষের মুখের উপর সরাসরি টর্চ ফেলতে পারে না। হয়তো কখনো পারবে। টর্চের উপচে আসা আলোয় সে সেই বৃদ্ধকে দেখে, যার চুল দাড়ি রবীন্দ্রনাথের মতো। লোকটা একখানা লম্বা হাত বাড়িয়ে দেয় তার দিকে।

অশোক পকেট থেকে দেশলাই বের করে এগিয়ে দেয়।

বৃদ্ধ দেশলাই নিয়ে সিঁড়ির উপরে বসে। আগুন জ্বালিয়ে বিড়ি ধরায়, জ্বলন্ত কাঠিটা অশোকের মুখের সামনে ধরে। বলে, 'আমি' কে, সিটা তো চিননো না?

বলে নিভে যাওয়া কাঠিটা ফেলে দিয়ে দেশলাইটা ফেরত দেয়, এবার আগের কথার রেশ টেনে বলে, অ্যাঁ?

অশোক বলে, আমি ব্লক অফিসের লোক। এর থেকে প্রাঞ্জল পরিচয় এই মানুষটার কাছে আর হতে পারে না ভেবে সে একথা বলে।

—অ, বেঁকির ঘরেৎ যামেন, তাই এঠি আইসে বসি আছেন ?

উত্তরের অপেক্ষা না করে বৃদ্ধ মুখটা অন্য পাশে ফেরায়, তারপর গলা একমাত্রা নামিয়ে হঠাৎ অন্যরকম কথা বলতে থাকে, যেন অন্য লোকের সঙ্গে। এমন জড়ানো বিরক্ত গলায় এই দ্বিতীয় মাত্রার কথা সে বলছিল যে, অশোক ভালো করে বুঝতেই পারছিল না সে কী বলছে। সে বলছিল, কথা শুনলি না—গায়ের জোর তো কঙ্কনায় মণ মণ আইখর মাছ—চিতল—দহেৎ রুই মিরকা—হাঃ!

অশোকের গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে হঠাৎ। একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি অন্ধকারের মধ্যে তাকে সচকিত করে। এ লোকটা কী ? উন্মাদ ? অন্য কিছু ?

—বেঁকির ঘরেৎ যামেন তো ? (খা এখন মাছের পয়সা—হাঃ! নৌকা—জাল—পাঁচমণ আইখর মাছ মাঠের জমিৎ পুতে ফেলালু—) যামেন তো বইসে আছেন ক্যান্ ? সাঁঝ বেলাৎ নজ্জা নাগোছে ?

অশোক ফাঁকতালে কোনোমতে বলতে পারে, কে বেঁকি ?

—বেঁকিক্ চিনেন না ? বেঁকি—বেঁকি খানকি, মোর ভাস্তি নাগে (মোছলমানের দেশেৎ থাকবু না! ক্যান্ ? —দেশ কই—হিন্দুস্থান! —পয়সা নাই—দেশও নাই—বাস্তনের ছোলের সাথ বেটির বিহা দিবি! —মাগছোল নাই ঠিক হল কি না ? হাঃ) বোলক আপিসের নোক আর বেঁকিক্ চিনেন না! হাঃ ?

অশোক ঘামছিল ভেতরে ভেতরে। একই ব্যক্তি একই সঙ্গে দুই সত্তায় থাকে কী করে ? হোক উন্মাদ, তবুও! ব্লক অফিসের লোক বেঁকির ঘরে যায়। বেঁকি খানকি। কে যায় ? কে কে যায় ? একটা চক্রান্তের মতো ইচ্ছা তার ভেতরে প্রবল হয়ে ওঠে। তার প্রতিপক্ষের গোপনীয়তা জানবার একটা সুযোগ তার হাতের কাছে। কিন্তু এরকম একটা ঘৃণ্য উপায়ে ? সে কি এতই নীচ হয়ে গেছে ?

অশোক বল্লে—না, চিনি না। আমি এমনি এখানে বেড়াতে এসেছি।

—এংকাই বেড়াবা আসিছেন? বোলক আপিসের নোক? হাঃ! নিশিবাবু, পোকাশবাবু বেঁকির ঘরেৎ যায়, আর তুমি যামেন না!

পরক্ষণেই বৃদ্ধ তার দ্বিতীয় সত্তায় চলে যায়। তার জড়ানো স্বর ভিন্নতর মাত্রায় কাউকে উপহাস করে, ধিক্কার দেয়, ঈশ্বরকে অভিশাপ দেয়।

আর এই ফাঁকে অশোক সদ্য-শোনা নাম দুটোর ধাক্কা সামলায়। প্রকাশ তার বড়োবাবু, নিশি ক্যাশিয়ার, দুজনেই বিবাহিত, সন্তানের জনক। আজ দুজনেই—তারা বেশ সোচ্চার এবং জঙ্গী ছিল।

—আপনার নাম কী?

—আমাক্ চিনেন না? আমাক্ চিনে না কে! হাঃ! আমি ধামান সাঁইদার। উনপঞ্চাশখান নাও আমার রাজশাহীর পদ্মায়।

লোকটা এবার নিজেকে গুলিয়ে ফেলে। এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথমবার। অশোককেই বলে, নাও আর জালের ভাড়া আগাম দিবার হোবে, লয়তো লয়। সিধা কথা।

তারপর অন্ধকার নদীর দিকে তাকিয়ে একটা হাঁক দেয়, হে-ই-ই, সাবি—ই, গাবের জাল দেখিছিস? হাঃ! তারপর খুব ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে অশোকের দিকে তাকিয়ে বলে, দশ মণ নোহার কাঠি আর দশ টিন আলকাতরা, দাম কত?

অশোক পকেট থেকে সিগারেট বের করে বলে, সিগারেট খাবেন?

সে এখন সহজ হয়ে গেছে। অস্বস্তির ভাবটা কেটে গেছে তার।

ধামান সাঁইদার অসংকোচে হাত বাড়িয়ে সিগারেট নেয়। অশোক সিগারেট ধরায়, ধামানের সিগারেট ধরিয়ে দেয়। ধামান চুপচাপ বসে সিগারেট টানে।

রহস্যের আবরণ উন্মোচনের আকর্ষণ মানুষের চিরকালের। সব

মানুষের। অশোকের তো তার উপরে অন্য কারণও আছে। সে বলে – প্রকাশবাবু, নিশিবাবু, এরা রোজই আসে নাকি ?

ধামান এতক্ষণে আবার বিড়বিড় শুরু করেছিল। অশোকের কথার উত্তর দিতে কিন্তু তার ভুল হয় না। বলে – আসে, পেরায়ই আসে।

– আর কে কে আসে ?

– পান্নুবাবু আসে। আরো কত নোক আসে, আমি কি বেবাক মানুষ চিনি ? পোকাশবাবু, নিশিবাবু আমাক্ টাকা দেয়, নিশা দেয় এক গেলাস, ঐ শালো পান্নুবাবু দেয় না। তুমি আমাক্ দুটা টাকা দেও তো তোমাক্ আমি বেঁকির ঘরেৎ নি যামো। দিমেন ? বেঁকি খুব ভালো খানকি, মোর ভাস্তি বলে কছি না কিন্তু। বেঁকির কোমর এই এংকা সরু, আর –

তারপরের কথাগুলো শুনে অশোকের মাথা কান ঝিম্‌ঝিম্ করতে থাকে, শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল ঘাম নামে। ধামান অত্যন্ত অশ্লীল ভাষা ও ভঙ্গিতে বেঁকির দেহ ও রূপযৌবনের বর্ণনা করে। বেঁকির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের লোভনীয় ছবি তুলে ধ'রে অশোককে সে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করে, খলবল করে হাসে। সিগারেট ধরা তার হাতখানা অন্ধকারের মধ্যে যেন আগুনের রেখা দিয়ে ছবি আঁকে।

– যামেন ? মোক্ খ্যালি এক গলাস নিশা খাওয়ার পয়সা দিমেন ?

অশোক হঠাৎ শিউরে ওঠে। সে বোঝে এখন ওঠা দরকার। অথচ একটা ভয় তার পা-দুটোকে আটকে রাখে। একবার বালক-বয়সে কলকাতার একটা পার্কে সন্ধ্যাবেলা একটা লোক কথা বলতে বলতে, তার হাত নিয়ে খেলা করতে করতে তাকে সম্মোহিত করে ফেলেছিল। সম্মোহনটা ছিল ভীতির। সে লোকটাকে বাধা দিতে পারছিল না, আতঙ্কে উঠতেও পারছিল না। তারপর অনেকক্ষণ ধরে একটু একটু করে সাহস সঞ্চয় করে সে সহ্যের সীমায় পৌঁছে যায় এবং তখনই উঠে আচমকা একটা দৌড় লাগায়।

অন্ধকারে সিঁড়ির উপর ধামান সাঁইদারের পাশে বসে এখন তার সেইরকম একটা ভয় লাগে। হয়তো অত তীব্র নয়, কিন্তু তবুও একটা অস্থির বিপন্নতা, যা তাকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াতে দিচ্ছে না।

হঠাৎ ধামান নদীর দিকে তাকিয়ে হাত মুখে ধরে একটা রক্ত-হিম-করা আওয়াজ তোলে। একটা প্রলম্বিত লয়ের হাঁক। আওয়াজটা উঁচু পর্দা থেকে কাঁপতে কাঁপতে নীচে নেমে আবার উঁচু হয়ে আচনকা থেমে যায়। বালিয়াড়ি এবং নদী পার হয়ে শব্দটা ওপাশের উঁচু পাড়ে গিয়ে ধাক্কা খায়। ধামান কান পেতে পুরো প্রতিধ্বনিটা শোনে, তারপর আবার সে সেই হাঁক দেয়।

তখন বাঁধের বসতির দিক থেকে একটা লণ্ঠনের আলো এগিয়ে আসতে থাকে এবং কোনো স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর 'জ্যাঠা' বলে ডাক দেয়।

আলোটা সিঁড়ির একেবারে উপরের ধাপে এসে থামে। অশোক উঠে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে ধামানও।

সে বলে, আমি নদীৎ যামো। আমার নাও ফেরে না ক্যান্?

ধামান সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে অন্ধকারের মধ্যে।

স্ত্রীলোকটি নতুন মানুষ দেখে আর এগোয় না।

অশোক তার পাশ কেটে এগিয়ে যায়। স্ত্রীলোকটি যে বেঁকি, তাতে সন্দেহ নেই।

সে বলে, কে আপনে?

অশোক দাঁড়ায়। একটু সময় চুপ করে থেকে বলে, আমাকে চিনবে না।

কথাটা বলতে তার একটু সময় লাগে, কেননা সে 'আপনি' বলবে, না 'তুমি' বলবে—এই দ্বিধায় পড়েছিল। তারপরে ঐ কথাটা অর্থাৎ 'আমাকে চিনবে না' বলে। কারণ বেঁকির চেহারা সস্তা বেশ্যার মতো। সস্তা কিন্তু লণ্ঠনের আলোয় তাকে চটকদার দেখাচ্ছে।

বেঁকি সন্দিগ্ধ প্রশ্ন করে, এঠি আসিছিলেন ক্যান্?

—বেড়াতে এসেছিলাম।

অশোক আর দাঁড়ায় না, বাঁধের রাস্তা ধরে পুবদিকে এগোতে থাকে। সামান্য এগোলেই বাঁ হাতে একটা কাঁচা রাস্তা আছে। এ রাস্তা অশোক চেনে। এই কাঁচা রাস্তা ধরে মিনিট পাঁচেক এগোলেই পাকা রাস্তা। সেই রাস্তা সোজা গিয়ে হাসপাতালের পাশ দিয়ে, বি ডি ও অফিসের পাশ দিয়ে বাজারের দিকে গেছে। আরো খানিকটা এগোলে অশোক বেঁকির তীক্ষ্ণ গলা শোনে, 'জ্যাঠা—কুনঠি গেলা ?' ধামান সাঁইদার নীচের অন্ধকারের কোন্ অদৃশ্য স্থান থেকে 'এ-হে-ই-ই' আওয়াজ তোলে। সেই প্রলম্বিত নদীর ব্যাপ্তিতে কাঁপতে কাঁপতে দূর থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়া আওয়াজ। কোনো এক অতীত ঝড়ের স্মৃতিবিজড়িত গহন রাতে ধামান সাঁইদার তার উনপঞ্চাশ নাওয়ের সাঁইকে ডেকে পাড়ে আনছে হয়তো।

দিনের বিষণ্ণতা এবং বিরক্তি এখন আর তেমন টের পায় না অশোক। ধামান সাঁইদারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তার বিক্ষিপ্ত এবং ক্ষুব্ধ মন অনেক স্থিতধী হয়েছে। বিষয়ান্তরের নিবিষ্ট চিন্তায় দৈনন্দিনের গ্লানি কেটে যায়। সে পথ চলতে চলতে ধামান, বেঁকি ইত্যাদির কথা ভাবতে থাকে।

হাসপাতালের কাছাকাছি আসার পর অশোকের ইচ্ছা হয় ইরাবতীর কাছে যাবার। যেহেতু এখন বেশ কিছুটা ভারমুক্ত নিজেকে লাগছে, সুতরাং ইরাবতীর সান্নিধ্যে যাওয়ার ইচ্ছা মনের মধ্যে প্রশ্রয় পেতে থাকে। ঘড়িতে এখন প্রায় ন'টা বাজে। এ সময় ইরাবতীর কাছে যাওয়া উচিত কিনা, এরকম একটা দ্বিধাও আবার তাকে নিরস্ত করতে থাকে।

হাসপাতাল বাস-রাস্তার উপরেই। হাসপাতালের সামনে কয়েকটা চা মিষ্টি পান সিগারেটের দোকান এবং একটা সস্তা হোটেলও আছে। দোকানগুলো অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে। কেননা ভর্তি-হওয়া রোগীদের লোকজন অনেক সময়ই রাতে থাকে।

অশোক ঠিকমতো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না বলেই বোধহয় একটা

সিগারেটের দোকানের সামনে সিগারেট কিনতে দাঁড়ায়। সিগারেট নিয়ে দাম দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই তার নজরে পড়ে দৃশ্যটা।

হাসপাতালের বাড়ির সামনে অনেকখানি জায়গায় ঘাসের উঠোন। উঠোন ছাড়িয়ে রাস্তা। উঠোনের শেষে বেশ-কিছুটা জায়গা জুড়ে অনুচ্চ পাঁচিল। সেখানে আলো-আঁধারির মধ্যে চার-পাঁচজন যুবক বয়সের ছেলে দেয়ালে কিছু পোস্টার সাঁটছে। একজন বাঁ হাতে লম্ফ ধরে কিছু লিখছেও।

দেখার সঙ্গে সঙ্গেই অশোকের ভিতরে যে প্রথম প্রতিক্রিয়া হয়, সেটা প্রায় অসহায় আত্মসমর্পণের পর্যায়ের। 'না না, এর লক্ষ্য আমি কিংবা ইরাবতী নয়', এমন একটা করুণ প্রার্থনা তার ভেতরে সোচ্চার হয়ে ওঠে। অথচ পায়ে পায়ে সেই দেয়ালের কাছাকাছি যেতে তার মানসিকতা সম্পূর্ণ পাল্টে যায় এবং সে হাত ও পায়ের পেশীর ভিতরে, শিরা-উপশিরায় অন্ধকার প্রতিহিংসাপরায়ণ ক্রোধই শুধু অনুভব করে।

কয়েকখানা পোস্টারের বামগন্ধী স্লোগান যার মতো মিথ্যা ভণ্ডামির আর কোনো দরকার আছে বলে কেউ মনে করে না। কয়েকখানায় উন্নয়নের কাজে অবহেলায় বি ডি ও-র প্রতি হুমকি। আর বাকি খানচারেক পোস্টারে বি ডি ও এবং মহিলা ডাক্তারকে নিয়ে কদর্য অশালীন ইঙ্গিত। এ ছাড়াও খানদুয়েক আছে যাতে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোককে নিয়ে অশ্লীল কার্টুন আঁকার চেষ্টা।

অশোক স্থির দাঁড়িয়ে টর্চ ফেলে ফেলে সব-কটা পোস্টার দেখে। বেপরোয়া পাঁচজন যুবকের দু'জন এগিয়ে এসে প্রায় যুদ্ধে আহ্বান করে তাকে।

—টর্চ মারছেন কেন, অ্যাঁ ?

মাত্র গতকালই সে পরিমলকে মুরোদ দেখাবার জন্য এগিয়ে আসতে বলেছিল। নিপীড়িত স্নায়ু কীভাবে ক্রিয়াশীল হবে, মস্তিষ্ক কীভাবে নির্দেশ তরঙ্গ পাঠাবে শিরা-উপশিরা, পেশীতে প্রত্যঙ্গে, তা

আগে থেকে নির্দিষ্ট থাকে না। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া শুধু স্থূল মানুষের নির্বোধ অভিব্যক্তি নয়। তাই একথার উত্তরে অশোকের গলা থেকে যে আওয়াজ বের হয়, তাতে তার নিজের কানেই বিস্ময় লাগতে পারত। সেটা একটা ভাঙা কর্কশ ক্রুদ্ধ জিজ্ঞাসা।

—এগুলো হচ্ছে কী ?

সামনের যুবকের কণ্ঠার হাড় দু'খানা বড়ো বেশি প্রকট। দুই হাড়ের মাঝখানে একটা গভীর গর্ত। রুক্ষ, কর্কশ ভঙ্গিসর্বস্ব চেহারা। অশোক সরাসরি তার মুখে টর্চ ফেলে। সে ভবেশ, অনাদির শালা। অশোক তাকে চেনে। অনাদি তাকে পঞ্চায়েতে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তবে চাকরি ভবেশকে করতে হয় না, সে এমনিই মাইনে পায়।

—মুখের থেকে টর্চ নামান! কী হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন না ? শালা যত ন্যাকা চৈতন! হ্যাট্—

কেননা তখনো অশোক ফোকাস্ তার মুখেই ধরে ছিল, তাই 'হ্যাট' বলে হাতের ঝট্‌কা দিয়ে ভবেশ অশোকের হাতের টর্চ মাটিতে ফেলে।

পিছনের যুবক ভবেশের জামায় টান দেয় এবং চাপাস্বরে বলে, এই বি ডি ও সাহেব!

ভবেশ একটা অশ্লীল পরিবর্ত ব্যবহার করল সঙ্গীর উচ্চারিত 'বি ডি ও সাহেব' কথাটার। অর্থাৎ সে আগেই অশোককে চিনেছে।

অশোক উন্মাদের মতো সামনের দিকে একটা ঝাঁপ দেয়, যেমন হাসপাতালের জানলা কিংবা বারান্দার থেকে লাফ দেয় যন্ত্রণাকাতর রোগী।

—শুয়োরের বাচ্চা—!

তার দু'হাতের মুঠিতে ভবেশের জামার দুই বুক। একটা ঝট্‌কা দিয়ে জামার বোতামগুলো সে বিচ্ছিন্ন করে। আরেকটা ঝাঁকানিতে ভবেশের মাথা অশোকের চিবুকের কাছে চলে আসে।

দেখা যায়, অশ্লীল পরিবর্ত ভবেশদের একচেটিয়া নয়। শুধু স্থান-কাল-পাত্র-পরিবেশ-প্রতিবেশ-সাপেক্ষ।

অশোক তাকে টেনে দোকানের আলোর সামনে আনে। তার চিৎকারে আকৃষ্ট দোকানের লোকজন, দু-চারজন আশপাশের মানুষ। ভবেশের দূরবর্তী সঙ্গী তিনজন খানিকটা দৌড়ে এসে অশোককে চিনতে পেরে থমকে দাঁড়িয়েছে। নিকটের সঙ্গী বিমূঢ়। আর ভবেশ তার দু-হাতের জাঁতাকালে শুধু নিজেকে মুক্ত করার জন্য কসরৎ করে যাচ্ছে, মুখে বেপরোয়া খিস্তি।

অশোক তার একখানা হাত ঘুরিয়ে পিছনে মুচড়ে রাখে, প্রতি মুহূর্তেই চাপ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে তার হাতখানা চূর্ণ হওয়ার প্রান্তিক সীমায়। ভবেশের দূরবর্তী তিনসঙ্গী বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করে।

অশোক গলা ফাটিয়ে তাদের সতর্ক করে, বিকট বিশৃঙ্খল তার গলার স্বর :

—এক শালা এগোবি তো এ শুয়োরের বাচ্চা খুন হয়ে যাবে, মনে রাখবি।

বয়স্ক হোটেলওয়ালা কাছে এগিয়ে আসে। বলে, ছাড়েন স্যার। আপনার কি এ-সব সাজে ?

অশোক তাকেও খাতির করে না। বলে—খবরদার, কাছে আসবেন না।

সে ভবেশের হাতে জোরে একটা চাপ দেয়, ভবেশ মরণ আর্তনাদ করে ওঠে। ফলে আশপাশ থেকে আরো লোকজন বেরিয়ে আসে।

হোটেলওয়ালা দূর থেকেই বলে, কিন্তু কী হয়েছে স্যার, সেটা বলবেন তো ? কী হয়েছে রে মানিক ?

মানিক ভবেশের নিকটবর্তী সঙ্গী। সে হাত তুলে পোস্টারগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে।

ব্যাপারটা অন্যরা এতক্ষণে বুঝে ফেলেছে। এ নিয়ে ভিড়ের ভেতরেও আলোচনা চলছে।

অশোক বলে, এই শুয়োরের বাচ্চাদের বলুন, আমার নামের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলতে।

হোটেলওয়ালা বলে, যা মানিক, পোস্টারগুলো ছিঁড়ে দিয়ে আয়। এ-সব কী ভদ্রলোকদের নামে ? ছিঃ!

মানিক একবার ভবেশের দিকে তাকায়। অশোক ভবেশের হাতে আরেকটা চাপ দেয়। ভবেশ আবার আর্তনাদ করে ওঠে। অশোক বলে, কী রে শালা, বল তোর চেলাদের!

তারপর মানিক গিয়ে পোস্টারগুলো ছেঁড়ে।

অশোক হাত ছেড়ে দেয় ভবেশের। ভবেশ একটু দূরে গিয়ে আবার তুখোড় খিস্তি শুরু করে।

—দেখে নেব শালা তোমাকে, তুমি কত বড়ো বি ডি ও। মায়ের দুধ যদি পিয়ে থাকি—ইত্যাদি।

দু-তিনজন লোক ভবেশকে টানতে টানতে দূরে নিয়ে যায়। দূর থেকেও তার চিৎকার শোনা যায়।

অশোক একটা সিগারেট ধরায়। ভিড়ের মানুষ কেউ তার কাছে এগোয় না। একমাত্র হোটেলওয়ালা বলে, কী যে-সব হচ্ছে আজকালকার ছেলেরা, স্যার!

অশোক সিগারেটে টান দিয়ে বলে, আপনাদের জন্যই হচ্ছে। এ-সব বজ্জাতি চোখের সামনে দেখছেন, কিছু বলতে পারছেন না ?

হোটেলওয়ালা বলে, কে কাকে কী বলবে স্যার ? কার ঘাড়ে ক'টা মাথা ? আপনি বাড়ি যান স্যার। এখানে আর থাকবেন না। কী যে হ'ল কালে কালে, একটা হাকিম মানুষ, তাকেও—

অশোক এগিয়ে গিয়ে টর্চটা খুঁজে নেয়। একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে সে বাসার দিকে চলতে শুরু করে।

যে অতিরিক্ত সিগারেট প্যাকেট হাসপাতালের সামনের দোকান

থেকে অশোক কিনেছিল, সেটা না কিনলে সারারাতের জন্য জীবন তার দুর্বিষহ হ'ত, এই দূরদর্শিতাই যেন তার সারারাতের সান্ত্বনা থাকে। অনেক চেষ্টা করেও ঘুম তার আসে না। সমস্ত দিনটার ভিন্ন ভিন্ন সংঘর্ষ, সংঘাত এবং সব মিলিয়ে হারজিতের গড়ে জয়ের পাল্লাই তার দিকে ভারী। এবং শেষ পর্যন্ত তার হিংস্র, উগ্র ও প্রমত্ত আচরণ তাকে সারারাত্রির নির্ঘুম হতাশা ও গ্লানিতে নিক্ষেপ করে। এখন আর কোনো সিদ্ধান্ত যেন তার হাতের মধ্যে নেই, নেই ঘটনার উপর নিয়ন্ত্রণ। ভবেশ ইত্যাদিদের সঙ্গে নিষ্পত্তির সময় যে-সব শব্দ সে উচ্চারণ করেছে, তার হীনতা এবং ক্ষুদ্রতা যৌন-অপরাধের গ্লানির মতো তাকে একটা আত্মধিক্কারের নিঃসঙ্গ পরিমণ্ডলের মধ্যে টেনে এনেছে। সহজ প্রবৃত্তিজাত আচরণ বিচারবুদ্ধি নিরপেক্ষ বলে সুস্থ ও বুদ্ধিমান প্রাণীর কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, তা যতই অকৃত্রিম হোক এবং যতই নিষ্পাপ প্রাথমিক হোক। আর সহজ প্রবৃত্তির সহজতা নির্ভুলভাবে তাৎক্ষণিক। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের ক্ষেত্রে, বুদ্ধি তাকে আশ্রয় করে নেয় এবং তারপরে যা ঘটে, তার কিছুই আর সহজ থাকে না। তখন পুরোটাই চেতনার অনুশীলনের ধারাবাহিক ফল।

অশোকের ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়াটাকে যদি সহজ প্রবৃত্তিজাত ধরতেই হয়, তাহলে সেখানেই তার শেষ। তারপর সে দেখেছে— এক : শারীরিক দিক থেকে ভবেশ তার চেয়ে হীনবল। দুই : স্থান পানজোড়া ব্লক এবং সে এখানকার বি ডি ও অর্থাৎ হাকিম (এখনো)। তিন : ভবেশের সঙ্গীরা এগোবার আগে সাত-পাঁচ ভাববেই। চার : ভবেশ কাজ না করে মাইনে নেয় বটে, কিন্তু তার মাইনের বিলে অশোকই সই করে। পাঁচ : আশপাশে মানুষজনের উপস্থিতি আছে। ছয় : প্রশাসনকে উপরে যতই দুর্বল মনে হোক, এখন পর্যন্ত প্রশাসনই সব থেকে শক্তিশালী, একথা অবচেতনে হলেও অশোকরা জানে।

এই-সব হীন পদ্ধতি, যাতে সন্দেহ হয়, সহজ-প্রবৃত্তিজাত বিষয়টা

(এ ক্ষেত্রে অশোকের ঝাঁপিয়ে পড়া) আদৌ অতটা নির্দোষ কিনা। তারপর তার ব্যবহৃত ভাষা, আস্ফালন, হাতের মোচড়, ভবেশের মরণ চিৎকার এবং সে কারণে উল্লসিত অশোকের প্রাগৈতিহাসিক গিরগিটির মতো লেজ-আছড়ানো পশ্বাচার—এ-সব তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ?

সে নিঃসন্দেহ হয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে যে, এই চাকরি (বা যে-কোনো চাকরি) তাকে অধঃপাতিত করবেই, প্রচলিত ধারণায় সৎ কিংবা অসৎ, যে-কোনো রাস্তাই সে ধরুক-না কেন।

আগামীকাল কিংবা তার পরের দিনও সে ইরাবতীর কাছে যাবার কথা চিন্তা করতে পারবে না। তার কারণে ইরাবতী ক্রমাগত লাঞ্ছিত, এই লজ্জায়। অথচ সম্পর্ক এখনো এমন নয় যে বলা যায়—এসো, আমরা দুজনে এর প্রতিকারের রাস্তা খুঁজে বের করি। ইরাবতীর কাছে যেতে তার এখন শুধু লজ্জা নয়, ভয়ও হয়। ধামান সাঁইদার তার হারানো উনপঞ্চাশ নাওয়ের সাঁইকে ফিরিয়ে আনতে অন্ধকারেও নদীর কাছে যেতে পারে, অশোক কি কোনোদিন পারবে ?

সুপিন বর্মন সকালে পানজোড়া হাসপাতালে গিয়েছিল, ফিরেছে দুপুর পার করে। গতকাল সন্ধ্যাবেলা তার পায়ে একটা গজাল ঢুকেছিল। প্রায় দু-ইঞ্চি পরিমাণ ঢুকে গজালটা আটকে থাকে। প্রতিবেশী একজন আচমকা টানে সেটা তুলে ফেলে। তখন শুরু হয় রক্তপাত। কাল সারারাত ব্যথা-বেদনায় সে কষ্ট পেয়েছে। জ্বরও হয়েছে। আজ সকালে উঠেই সে ছেলেকে নিয়ে তাই হাসপাতালে গিয়েছিল।

এখন গোরুর গাড়ি থেকে নেমে ছেলের ঘাড়ে ভর রেখে সে এসে ঘরে ঢোকে। হাতের কাজ ফেলে রেখে সুপিনের বউ মোহিনী তার খোঁজ নিতে আসে। মোহিনী বলে, গায়েৎ জ্বর আর আছে ?

—না, আর তো মোনৎ হোছে না।

সুপিন একটু আনমনা।

মোহিনী তার গায়ে আর কপালে হাত দেয়।

—এনা ছিক্ ছিক্ নাগোছে য্যান্ ?

সুপিন উত্তর দেয় না। অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে।

মোহিনী বলে, গুড়মুড়ি দিমো না ভাত খামেন ?

—না, কেছু খামো না।

—ক্যান, খিদা নাই ? হাসপাতালেৎ খাছেন কেছু ?

সুপিন তেমনি আনমনার মতো মাথা নাড়ে। বাইরের থেকে ছেলে হাঁক দিয়ে বলে—মাও, ভাত দি। খিদা নাগে।

মোহিনী তখন ভালো করে তাকায় মানুষটার দিকে। সুপিনের বড়ো-সড়ো চেহারাটায় একটা বিষাদের ছায়া। সে বলে, কী হইল হায় ? কথা ক'ছেন না যি ?

—না, কেছু লয়।

—কেছু লয় তো এংকা ভোম্ মাইরে আছেন ক্যান্ ?

—ক'মো, আগেৎ ছোওলোক্ খাবার দি।

মোহিনী তার মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে বাইরে বেরিয়ে যায় ছেলেকে ভাত দিতে। আবার মিনিট দুয়েকের মধ্যেই সে শাড়িতে হাত মুছতে মুছতে ফিরে আসে।

—হাসপাতালেৎ নাকি মারপিট হইছে, আমিন ক'লো ? আমিন অর্থাৎ রামেন—রামেন্দ্র, তাদের ছেলে।

সুপিন তেমনি চিন্তান্বিতভাবে শুধু মাথা নাড়ে।

—ক্যান্ ? কী হইছিল কও-না ? কে কাক্ মারল !

সুপিন তার দিকে ফিরে তাকায়। বলে, সি-ই যে ডাক্তার দিদিমণি, তোক্ দেখাবার নি' গেছুনু, তাক মারিছে।

—হায় মাও! মেয়ামানষের গায়েৎ হাত! ক্যান্? ক্যেয় মারিছে?

—ক্যান্, সিটা তো আমিও ভাববা ধরিছু সি সকাল থিকা। কিন্তু এখন তক্ হোঁস কেছু করবা পারি নাই।

মাস দুয়েক আগে সুপিন একবার রামেনের মাকে নিয়ে

হাসপাতালে গিয়েছিল। মোহিনীর কিছু মাসিকের গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল। শিকড়-বাকড় খেয়ে কোনো কাজ হয়নি। কোনো কোনো মাসে ভীষণ স্রাব হ'ত, কোনো মাসে নাম মাত্র। আর ছিল যন্ত্রণা।

সে সময় সে ডাক্তার দিদিকে দেখেছে। এর আগে এ অঞ্চলের মানুষ আর মেয়েলোক ডাক্তার দেখেনি। সুতরাং ইরাবতী অনেকের কাছেই বিস্ময় ছিল। মোহিনীর খুব ভালো লেগেছিল ডাক্তার দিদিকে। কী সুন্দর কথা বলে! তখন ভারি লজ্জা লাগছিল মোহিনীর।

ডাক্তার দিদি জিজ্ঞেস করেছে, নাম কি?

মোহিনী বলেছে, মোহিনী বম্মনী।

নাম শুনে দিদি চোখ তুলে তাকিয়েছে। কী সুন্দর বড়ো বড়ো ঝকঝকে চোখ।

—স্বামীর নাম কি?

মোহিনী জানে এই প্রশ্নে অফিস আদালতে হাসপাতালে ভারি হাসাহাসি হয়, কেননা অনেকেই স্বামীর নাম মুখে আনতে চায় না। সে কারণে খুব তাড়াতাড়ি সে উত্তর দিয়েছে।

—সুপিন বম্মন।

দিদি আবার চোখ তুলে তাকে দেখেছে। চোখে তখন সামান্য হাসি।

—বয়স কত?

ব্যাস্, মোহিনীর বিদ্যা শেষ, সপ্রতিভতাও উবে গেছে।

—কে জান্, কতবা হোবে? তুমি ক'ন্।

—আমি বলব!

দিদি বড়ো সুন্দর হেসেছিল শব্দ করে।

—আমি কী করে আপনার বয়স বলব?

তারপর কী ভেবে বলেছে— আচ্ছা, দেখি চেষ্টা করে। বাচ্চা ক'টি?

—হেই, বাচ্চা লয়, বেবাক ধাড়ি। এ্যাটা বেটি, দুটা বেটা।

মোহিনী মুখ পাশে ফিরিয়ে মুখে আঁচল দিয়েছিল। নিজের রসিকতায় নিজেই লজ্জা পেয়েছে সে। দিদি কী ভাবল ?

ডাক্তার দিদিও হেসেছে। বলেছে, গুড ! আচ্ছা বেশ ধাড়িই হ'ল, ছোটোটির বয়স কত ?

—ষোলো-সতেরো হবেও বা।

—তার উপরেরটি ?

—বেটা ছুটো বেটার থিকা পাঁচ বচ্ছরের বড়ো।

—গুড্, তার উপরে ?

—তার উপরে বেটি, বড়ো বেটার থিকা তিন বচ্ছরের বড়ো — এই তোমার পারা হোবে। ওলা কি গুটমুট কহোছেন, বুঝা পাঁরো না !

দিদি চোখ বড়ো বড়ো মিছাই ভয় দেখিয়েছে। বলেছে, আপনাকে গাল দিচ্ছি। এখন বলুন তো কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল ?

মোহিনী আবার বিপদে পড়ে। তারপর হাতের মাপে বয়স দেখাবার চেষ্টা করেছে।

—কি জান্ ? অত খ্যাল নাই। এই এংকা হবে ! তবি স্যায়না বয়স।

—তেরো-চোদ্দ হবে ?

—হাঁ, এংকাই হবে।

—তাহলে আপনার বয়স এখন চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে, বুঝেছেন ?

—হায় মাও, তবি তো বুঢ়া হোই গেলাম !

—কোথায় বুড়ো হয়েছেন, এখনো তো দিব্যি চেহারা আছে।

ডাক্তারদিদি মোহিনীর শরীরের দিকে তাকিয়েছিল।

তারপর ভিতরে নিয়ে গিয়ে দেখেছে ভালো করে, অনেক প্রশ্ন করেছে তাকে। তার মধ্যে আবার কিছু প্রশ্ন বড়ো মজার লেগেছে মোহিনীর।

যেমন, মাত্র তিনটি সন্তান কেন ? আর হয়নি ?

—না তো, ক্যান্ ?

—সবারই তো দেখি অনেকগুলো করে ছেলেমেয়ে! আপনি কী করে আটকালেন?

মোহিনীর সংকোচ কাটছিল আস্তে আস্তে, ভালো লাগছিল কথা বলতে। বলেছে, সব্বার লয়, তবি বেশিরভাগ মানষেরই ছোলপোল অনেক।

—তাই তো বলছি, আপনি কী করে আটকালেন?

—হেই বাপু, বেবাক জানে, ফের—ডাক্তার মানুষ—

—আমি কী করে জানব? আমার তো বিয়ে হয়নি।

—তবি ফের ডাক্তার হলেন কেংকা? ইসব জানা নাগে না? বইয়েৎ নাই?

ডাক্তার দিদি খুব হেসেছে। তারপর ঘনিষ্ঠভাবে বলেছে, বই পড়ে কি সব জানা যায়? অ্যাঁ? যায়?

কত সামান্য সময়ের আলাপ, তবু মানুষটাকে কত ভালো লেগেছিল। অমন লেখাপড়া-জানা মেয়েমানুষ. শুধু কি লেখাপড়া, তার উপরে ডাক্তার, তাতেও কেমন সরল সোজা দেখ। এতটুকু অহংকার নেই! তবে মানুষ তার গায়ে হাত দিল কেন? কী অন্যায় করেছিল সে?

—ক্যান্ তে? কি হইছিল হায়? দিদিক্ মান্ষে মারল ক্যান্? বেবাক কথা কও তো!

সুপিন সব কথাই বলে। সে দীর্ঘ সময় সেখানে ছিল। সবই দেখেছে, সবই শুনেছে। কাল মাঝরাতে বিশপুখরা গ্রাম থেকে একটি আদিবাসী মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে আসে তার গ্রামের লোক এবং আত্মীয়স্বজন। মেয়েটির প্রসব হতে কষ্ট হচ্ছিল। তড়্কা হচ্ছিল তার, মুখ থেকে গেঁজলা বের হচ্ছিল আর গায়ে ছিল ধুম জ্বর।

রাতে ডিউটি ছিল ডাক্তারবাবুর। কিন্তু রাতের ডিউটিতে কেউই হাসপাতালে থাকে না, তেমন দরকার পড়লে বাড়ি থেকে ডেকে আনতে হয়।

কিন্তু ডাক্তারের আসতে একটু দেরি হয়। তার কারণও বড়ো

বিচিত্র। ডাক্তারের বউ-এর নাকি খুব ভয়, তারও উপরে তার নাকি খুবই সন্দেহ-বাতিক। কাজেই রাতের বেলা একা সে কখনো ডাক্তারকে ছাড়ে না। বিশেষ করে এই নতুন ডাক্তার-দিদি আসার পর তো নয়ই। মেয়েমানুষের সন্দেহ-বাতিক থাকবেই। এ হ'ল জাতের স্বভাব। তাই রাতে যখন ডাক্তার হাসপাতালে আসে, তার বউও সাথে সাথে আসে। কী বজ্জাত মেয়েমানুষ রে বাবা!

—ইসব ছিড়া কথা বাদ দেন, আসল কথা কন। বাতিক পুরুষ মানষেরও থাকে, আমার জানবা কেছু বাকি নাই।

ডাক্তার যখন আসে তখন রোগিণীর মৃত্যু হয়েছে। নাড়ি দেখে, বুকে নল লাগিয়ে ডাক্তার কী একটা বিদঘুটে রোগের নাম বলে বাড়ি চলে যায়। যারা খাটিয়ার দোলায় করে রোগী নিয়ে এসেছিল, তারা-ই সকাল হওয়ার অপেক্ষায় মড়া পাহারা দিতে থাকে।

এর আধা ঘণ্টা বাদে পাহারাদারেরা মৃতের ঢাকার তলা থেকে একটা অস্পষ্ট ফ্যাসফ্যাসে আওয়াজ শোনে। তারা ভয় পায় এবং কলরব করে ওঠে। তাতে হাসপাতালের একজন কম্পাউণ্ডার ও একজন নার্স বাইরে আসে। বারান্দায় আলো জ্বলছিল। সবাই সেই আলোয় মনোযোগ দিয়ে মৃতদেহটি দেখতে থাকে। তখন মনে হয়, মৃতের দুই জংঘার মাঝখানে খুব মৃদু কিছু নড়ছে। প্রত্যুৎপন্নমতি নার্স এক ঝটকায় মৃতের আবরণ সরিয়ে ফেলে কাপড় তুলে দেয় কোমর পর্যন্ত। মৃতের দুই পায়ের মাঝখানে তার সদ্যোজাত শিশু, লক্ষণ ক্ষীণ হলেও কারো ভুল হ'ল না যে শিশুটি এখনো জীবিত। জীবিত কিন্তু মৃত মায়ের সঙ্গে বন্ধন এখনো তার ছিন্ন হয়নি।

নার্স অনেক চেষ্টা করল, বুকে পিঠে থাপড়াল, মুখে ফুঁ দিল, কিন্তু শিশু আওয়াজ করে না। কিছুক্ষণ পরেই বোঝা যায় সে-ও মরেছে।

যারা রোগিণীকে নিয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে ছিল সতীশ। লোকে তাকে লেংড়া সতীশ বলে জানে। সতীশ সামান্য লিখতে

পড়তে জানে। কাজেই সে যখন নেতা হয়ে উঠতে চেয়েছে, তার স্বজাতি আদিবাসীরা তাকে নেতা হতে দিয়েছে। যদিও সুপিনের পার্টি সতীশেরও পার্টি, সুপিন তবুও সতীশকে বজ্জাত বলতে ভুল করে না। সতীশ তার স্বজাতিদের ঠকিয়ে বেঁচে থাকে। তা সত্ত্বেও আদিবাসীদের বেশ বড়ো একটা অংশ তাকে মানে এবং তার কথা শোনে। তার কারণ—তাদের সবাই ঠকায়, সতীশও ঠকায়। তফাত এই, সতীশ তাদের নিজেদের লোক এবং সতীশ রিলিফ, ঋণ ইত্যাদি সবরকম সুযোগ-সুবিধার সন্ধান ঠিক সময়ে মানুষের কাছে নিয়ে আসে, মানুষকে সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্ত করে দেয়। এতে সতীশ যখন তাদের প্রাপ্ত সুবিধায় ভাগ বসায়, তারা তখন এটাকে তার ন্যায্য মজুরি হিসাবে মেনে নেয়। আবার অন্যরা যখন তাদের ঠকায়, সতীশ তখন প্রতিবাদ করে। ফলে সতীশ নেতা হয়েই থাকে। সুপিনের পার্টির বড়ো লাভ এইখানে। তাই তারা সতীশকে শাসন করে না।

বিবরণ এই পর্যন্ত পৌঁছোলে মোহিনী বলে, কাক্ শাসন করে! হামাহোরের পোধানোক্ দেখ। পোধান হোল আর দেখ্ না দেখ ঘরেৎ বান্ বান্ টিন ওঠালো। ওলা সব্বাই এক, যি যায় নংকা সি হয় আবোন! আফির কি হোল, সিটা ক’ন।

সকাল হওয়ার কিছু পরেই সতীশ গণ্ডগোল পাকিয়ে তোলে। বিশপুখরা থেকে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের দল হাসপাতালে এসে হাজির হয়। পানজোড়ার পার্টির জোয়ান ছেলেরা এসে হল্লা জুড়ে দেয়। কী? না, ডাক্তারের অবহেলায় রোগী মারা গেছে, আর শিশুকে তো ডাক্তার একরকম নিজের হাতেই খুন করেছে। এই হ’ল অভিযোগ। জবাব চাই, বিচার চাই, বদলা চাই।

ডাক্তার দিদি তখন সুপিনকে একটা ইনজেকশন দিয়েছে। পায়ের পট্টি খুলে ধোয়ামোছা করে ওষুধ লাগিয়ে আবার নতুন করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হচ্ছে। তখনই একদঙ্গল মেয়েপুরুষ সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

দিদি বলে, কী ব্যাপার, এখানে এত ভিড় কেন? এ কথার উত্তরে হাটুরে ভিড়ে যা হয়, তাই হ'ল। অনাদিবাবুর এক শালা ইদানীং খুব মস্তান হয়েছে। উঠতি বয়সের ছোকরা সে। তার একটা দলও আছে। সুপিনের পার্টিতে এই-সব ছোকরারা বেশ শক্ত জায়গা করে নিয়েছে। অথচ এরা পার্টিকে জানে না, পার্টির আগের কথাও জানে না।

সেই ছোকরাই গলা তুলে প্রথমে খেউড় শুরু করে। বি ডি ও এবং ডাক্তার দিদিকে নিয়ে নোংরা কথা এমন নোংরা ভাষায় বলতে থাকে, যাতে সুপিনের লজ্জায় মাথা কাটা যায়। ছোকরারা আজকাল রাস্তাঘাটে, অফিস-আদালতে সবাইকে শুনিয়ে এমন অনর্গল নোংরা কথা বলে যে, সুপিনের মনে হয়, এরা ভালো কথা শেখেইনি। সেই-সব কথা।

দিদি তখন ধমক দিয়ে তাদের বের করে দেবার চেষ্টা করে। তাতে ফল হয় উল্টো। ছোকরারা আরো বেপরোয়া হয়ে যায়।

দিদি বলে যে, আপনাদের কিছু অভিযোগ থাকলে আপনারা উপরে জানাতে পারেন, আন্দোলন করতে পারেন। আমাদের যদি অন্যায় হয়ে থাকে, আমরা শাস্তি পাব। কিন্তু এই মুহূর্তে সমস্ত কিছুর নিষ্পত্তি কীভাবে হবে?

তখন আরো খারাপ খারাপ কথা।

অনাদির শালা তখন সেই খারাপ কথার মধ্যেও একটা কথা বলেছে, যা শুনতে সুপিনের যুক্তিসংগত মনে হয়েছে। কথাটা হ'ল, সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা ক'রে একটা ডাক্তার তৈরি করে। সে টাকা দেশের টাকা। গরীব মানুষের রক্ত নিংড়ানো টাকা। আর সেই ডাক্তার পাস করে এসে গরীব মানুষের রক্ত চোষে আর গরীব মানুষকে অবহেলা করে।

কথাটা খাঁটি কথা।

সুপিন বলে, এগ্‌লা কথার মধ্যে সার আছে! তা সি যাউক্।

ফের কি হোল, শোন। মেয়েমানুষগুলা দিদিক্ ঘেরাও করে রাখলো। আর আমিও বেমক্কা পড়নো সি ঘেরাওয়ের মাঝেৎ। তাবাদে বাইরে তাক্যে দেখি ফের হল্লা আর এন্‌কেলাপ্। এন্‌কেলাপ্ আর ভাঙচুর। অন্য ঘরগুলায় জিনিসপত্র ভাঙার আওয়াজ শুনবা পাছি। দেখবা পাছি মানুষজনের ছুটাছুটি। ডাক্তারের বাড়ির দিকে একদল মানুষ ছুটে গেনো, দেখনো। ডাক্তার নাকি জানালা কবাট বন্ধ করে আছে। আমরা ইদিকে ঘরের মাঝেৎ আটক।

তখন লেংড়া সতীশ ঘরের মধ্যে চার-পাঁচটা ড্যান মাগীক্ ঢুকাই দিল। সেগ্‌লা সব বুড়ি মেয়ামানুষ আর সব কটা ড্যান তাৎ মোর সন্দো নাই। তাৎ ফের সব কটা নিশা খায়ে ডাং।

মোহিনী আঁতকে উঠে বলে, হায় মাও, ড্যান ?

সুপিন বলে—হঁ, ড্যান। ঝিরকুট্টি মারা চ্যায়ড়া, রোগা, চামসার শরীল, হাত পাওয়ের নখগুলান বড়ো বড়ো, চুল তালের আঁটির ফাঁসা, মুখের কষে আর চোখেৎ ফাকুন্দা। এগ্‌লা ড্যান না হয়া যায় না।

মোহিনী বলে, হায় মাও !

সুপিন বলে, বিশপুখরায় ঘরে ঘরে ড্যান আর ফোক্‌সিন। মা মাসি বিটিগুলাক ড্যান বানায়। বারো-চোদ্দ বছরের বিটিগুলাক নদীপাড়ের জঙ্গলেৎ নি যায়ে ফুল পাতা পড়ায়, বোঙ্গার সাথে বিহা দেয়, বাপ-ভায়ের অক্ত খাবার কড়ার করায়, তাবাদে ফের ঘরেৎ নি আসে। বিশপুখরায় ফি-বছর দুটা চারটা এংকা খুন নাইগেই আছে।

মোহিনী বলে, হায় মাও, এলা সব ছাঁচা ?

সুপিন বলে, ছাঁচা না মিছা বেবাক শুনেই বুঝবু। তো সি ড্যান মাগীগুলা দিদির চেয়ারের চারপাশেৎ চুল খুল্যে হাত-পা দোলায়ে নাচবা ধরল আর খোনা সুরে কিবা পড়বা নাগল, সেলা গান, না কান্দন, না গাল, বুঝা পারনো না। সি এক বিতিকিচ্ছি কাণ্ড। তাৎ দিদির বেজায় তরাস নাইগে যায়। আমি ছিনো আট-দশ হাত দূরের এটা নোহার খাটেৎ। ঘাটাঘাটিতে পায়ের বেথায় শরীল রবশ।

তখন ডাক্তার দিদি ঝপাং করে চেয়ার ছাইড়ে উঠে দাঁড়ালো। কারণ কি, ড্যানগুলা একে অন্যকে ধাক্কা দিয়া দিয়া দিদির গায়েৎ ফেলাছে। আমি বোঝানো এটা কিছু খারাপ উদ্দেশ্য আছে। দিদি উঠে দাঁড়াতেই সতীশ পিছু থিকা কিবা ক'ল কিচিং বিচিং কইরে। ওলা সাঁতাল ওরাংয়ের ভাষা কেবা বোঝে। তাৎ ড্যানগুলা দিদির গায়েৎ হাত দিয়া ঠাসান দিল। দিদি হাতের ঝটকায় মাগীগুলাক সরাবা গেল। তাৎ সতীশ যেংকা চাইছিল অংকাই হোল। মাগীগুলা দিদির গায়েৎ ঝাঁপায়ে পড়লো।

এ পর্যন্ত বলে সুপিন চুপ করে যায়। তার চোখে বিব্রত অস্থিরতা থিরথির করে। সে মোহিনীর দিক থেকে মুখ সরায়।

মোহিনীও আর কথা বলে না, চুপ ক'রে অপেক্ষা করে। কিছু সময় পরে সুপিন বলে—দেখ, মোহিন, তোর কাছেৎ মোর পাপ নাই, নজ্জা আঁড়ালও নাই। তবি তাবাদে যা কাণ্ড হোল সি ভারি নজ্জার কথা। য্যান মোর মোনৎ হছে, মুই পাপ করিছি।

সুপিন আবার সংকোচে থেমে যায়।

মোহিনী অধৈর্য হয়ে বলে, কী বা কবা চাছেন ? কিসের পাপ ? অ্যাঁ ? তাবাদে কী হোল, হাঁ ?

সুপিন বলে, তোর কাছেই বলি। আফির কে জান, কোটেৎ যদি মামলা ওঠে, তো ফের কবার হয় নাকি।

মোহিনী আরো অধৈর্য হয়ে ওঠে। বলে—আরি, এলা ছিড়া কথা বাদ দি আসল কথাডা কও-না! আফির কী হোল হায় ?

সুপিন বলে, গায়েৎ ঝাঁপায়ে পইড়ে সি ড্যান মাগীগুলা দিদির গায়ের জামা পরথমে টাইনে ছিড়া ফেলাল—

মোহিনী আঁতকে উঠে বলে, আই !

সুপিন বলতে থাকে, তাৎ দিদির চোখমুখ তখন ভয়ে সাদা হোই গিছে। আমি পষ্ট দেখনো। তো আমি এটা চিৎকার দি নামবা গেনো। নোহার খাট তো উঁচা আর তরাসে পায়ের বেথা মোর

বিসরোন হোই গিছে—তাৎ হুড়মুড়ায়ে পড়নো একেবারে শানেৎ। হাঁটুৎ আঘাত নাগল এমন জব্বর যি উঠবাই পারনো না কিছু সময়। তাকায়ে দেখি, হায় মোর পাপচক্ষু—দিদি খালি পিছাবার চেষ্টা করোছে আর ড্যানগুলা তার শাড়ি টাইনে কোমর পর্যন্ত খুলি ফেলাছে। তাবাদে পুরা শাড়ি—আর সি নাচ আর গান—নিশার গন্ধে ঘর ভর্তি—দরজার ছামোৎ হল্লা আর মজা- ড্যানগুলাক ওসাকাছে, মারবা কহোছে। তাবাদে তাকায়ে দেখি, হায় মোর লিলাজ চক্ষু—কোমরের শাড়ি নাই, গায়েৎ জামা নাই—আছে খালি শেয়া আর ঐ যি কি কয় বডি! দিদি পিছাবা যায়ে এক কোণায় জড় করা ময়লা, ব্যাণ্ডেজের রক্তমাখা তেনা, তুলা আর গামলার উপর পড়ে গেল। আর সি মাগীগুলা তখন তার চুল ছিড়া, নখ দিয়া আঁচড়ায়া মুখের আর বুকের কেচ্ছু বাকি রাখে না। মৌমাছি কি ভেঙ্গরুল ছাইকে ধরলে মানষে যেংকা দু'হাত দিয়া তাড়াবা ধরে, দিদি খালি অংকাই করছিল।

সুপিন তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে মোহিনী হতবাক এবং বিহ্বল। বলে—ছিক্‌কো, ছিক্‌কো! এলা মানুষ!

সুপিন বলে, তাবাদে কে একজন চেঁচায়, পুলিশ! আর হুটাপুটি নাইগে গেল। নিমেষেৎ দরজার সামনের ভিড় ফাঁকা। কিন্তু ই মাগীগুলান যে ড্যান, তাৎ মোর আর মিট্টিএনা সন্দো নাই। অন্য কতগুলা মেয়ামানুষ আর সতীশ তাদের হাত ধইরে টানাটানি করছে, তাও তারা যাবা চায় না। তাদের মাথাৎ তখন ফোকসিনি ধইরে গেছে। তারা নাচে, কান্দে, গান গায়—আর কী ঘেন্না—কাপড় তুলে দেখায়।

অনেকক্ষণ বাদে, যেন সে এতক্ষণ চোখের সামনে পুরো ব্যাপারটা ধরে ধরে দেখছিল।

মোহিনী বলে, পুলিশ আসলো, আফির—?

সুপিন বলে, পুলিশ আসলো কিনা, তখনো আমি জাঁনো না।

ঘর ফাঁকা হতে দিদির দিকেৎ ফিরবা দেখি, হায় মাও, তার চোখের দৃষ্টি সাদা!

—সাদা?

—হুঁঃ সাদা। দৃষ্টি নাই, থাকলেও চাউনিৎ ভাষা নাই। সি দৃষ্টি মানষের নয়। ছুব্‌লা জানোয়ার ভয় পালে যেংকা চায়, দিদির চাউনি অংকাই। বুঝা পারিছু মোহিন, আর যেন্ কেমন পাগল পাগল!

—হায় মাও, তাবাদে?

—তাবাদে আরো আছে। কোমরেৎ শেয়া আছে। কিন্তু গায়েৎ নাই তো নাই, একগাছা সুতাও নাই। বুঝিছু?

—তাৎ কী হয়লো? কী বুঝমো?

—বুঝা পারোছেন না? আরি যোবতী মেয়ামানুষ, আদোল গা, সামনে কাপড়, পাশে পরপুরুষ—তবি সি মেয়া কী কইরবে?

মোহিনীর বিস্ময় বিস্ময়েরও সীমা ছাড়িয়ে যায়। তার চোখেও স্বপিন যেন ডাক্তার দিদির চোখের ছায়া দেখে এখন।

সে বলে—হুঁ গেরস্থানি, হুঁ। তার মানে তাই। মোর পাপচক্ষু, আর আমি তোর স্বামী। তাই তোর গোড়ৎ ইসব কথা কবুল করোছি। ইসব ভগমান মোরে ক্যান্ দেখাল!

—আঃ, পস্কের কইরে কওনা, তাবাদে কী হোল? তোমার পাপের কথা মুই শুনবা চাঁও নাই।

—যা আমার বুদ্ধিৎ আওছে, তাই আমি কছি। বেশ কিছু সময় ডাক্তার দিদি হোঁসে ছিল না। তার মাথা কাম করে নাই, চোখের পলক পড়ে নাই, খ্যালি শূন্যে ফ্যাল ফ্যাল কইরে তাকায়ে ছিল। তে মুই কোনমতে উঠে কাপড়খান তার গায়েৎ ছুড়ে দিলো। কোনো সাড় নাই! য্যান্ বাঁশের আড়া থিকা কাপড়খান গড়ায়া পইড়ে গেল। হায় মাও, একি হোল? ইদিকে উঠানেৎ গাড়ি থামার শব্দ মানষের গলার আওয়াজ। আমি তাড়াতাড়ি কাপড়খান দিদির গায়েৎ জড়ায়ে দিবার গেনো। ওঃ, গায়েৎ হাত নাগার সাথ সাথ সি

কী চীৎকার রে, মোহিন! আঁ—আঁ করে খালি চেঁচাছে আর পিছায়ে যাছে। আমি তখন কোনোমতে দরজার ছামোৎ আসনো। দেখি দারোগাবাবু আর বি ডি ও-বাবু দৌড়ায়ে আওছে। আমি ক'নো, ভিতরেৎ যামেন না, আগে হু'জনা মেয়ামানুষ ডাকেন। বি ডি ও-বাবু দাঁড়ায়ে গেল, কেন্তু দারোগাবাবু আমাক ধাক্কা দিয়ে ভিতরেৎ গেল। আর ফের অংকা চিৎকার। তৎক্ষণ হু'জনা নার্স দিদি, কুনঠি বা মুকায়ে ছিল, আসল। আমি ক'লাম, ভিতরেৎ গিয়া আগে ডাক্তার দিদিক জামাকাপড় পিন্ধান। এই তো হোল বিত্তান্ত! তো এখন ক', মানুষ কোথায় গিয়া দাঁড়াছে!

স্থপিনের কাহিনী সেখানেই শেষ নয়। দারোগা তারপর স্থপিনের এজাহার নিয়েছে। স্থপিন সবই বলেছে। যাদের যাদের চিনেছে তাদের নামও বলেছে। এর মধ্যে কয়েকজন তার পার্টির লোকও আছে। মামলা একটা হবে, তাতে সন্দেহ নেই। মামলা হলে তাকে কাঠগড়ায়ও দাঁড়াতে হবে। তখন তাকে আবার সব বলতে হবে। তাতে পার্টির লোক ফেঁসে যাবে। স্থপিন এ-সব সমস্যার কথাও তার বউ-এর সাথে আলোচনা করে।

মোহিনী বলে, ফাঁসে তো ফাঁসবে। ফাঁসাই দরকার। এংকা অন্যায় মুখ বুজে সজ্য করবা হোবে? মানষের বিচার-বুদ্ধি কেছু থাকবে না?

স্থপিন বলে, সিটাই হোল কথা। আমি ফের পঞ্চাইতের মেম্বর। আর আমি যদি পার্টির নোকের নামেৎ কথা কই—

মোহিনী বলে, অংকা মেম্বরির মুখেৎ ঝ্যাটা। মেম্বর হয়ে কি তোমার পাঁচখান হাত গজাছে?

পানজোড়া সদর মহকুমার ব্লক নয়। সে কারণে কোনো ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত দ্রুত নেওয়া সম্ভব হয় না। পানজোড়া হাসপাতালের ঘটনায় প্রশাসন একটু হকচকিয়ে যায়। হাসপাতালের ডাক্তার বা অন্য কর্মচারীদের উপর মানুষের, সে যে-কারণেই হোক-না কেন,

ক্রোধ নতুন কিছু নয়। কিন্তু এ-ধরনের ঘটনা শহরের বড়ো হাসপাতালেই সাধারণত ঘটে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র কিংবা পানজোড়ার মতো ছোটো হাসপাতালে এমন ঘটনা অন্তত এ-জেলায় এর আগে কখনো হয়নি।

পুলিশ পিকেট বসলেও হাসপাতাল কয়েকদিন বন্ধ থাকে। হাসপাতালের কর্মীরা গুণ্ডাবাজির বিরুদ্ধে এবং নিরাপত্তার দাবিতে হাসপাতাল বন্ধ রাখে। শহরে এ-নিয়ে আন্দোলন শুরু হয় এবং আন্দোলন যাতে অন্য কারো হাতে না যেতে পারে সেজন্য অনাদির পার্টির অনুগত অফিস-কর্মচারীরা এই বিষয়ে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন করে।

ঘটনা এবং তার প্রতিবাদে আন্দোলন একই ঝাণ্ডার তলায় দাঁড়িয়ে একই সংগঠনের মানুষ করে। অশোকের মতো দু-চারজন স্মৃতিবান মানুষ ছাড়া এ ঘটনায় এখন আর কেউ আশ্চর্য হয় না।

হাসপাতালের গাড়িখানা সদরে। ঘটনার ছ'ঘণ্টা পরে ব্লকের গাড়িতে করে অশোক ইরাবতীকে সদরের বড়ো হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছে। ব্যবস্থা মতো ইরাবতী আপাতত সেখানে তার এক সহকর্মীর কোয়ার্টারে থাকবে। এই ছ'ঘণ্টার ভিতরে ঘণ্টা চারেক ইরাবতী ঘুমিয়েছে। পানজোড়ার প্রথম ডাক্তার, ডাক্তার চ্যাটার্জি তাকে একটা ঘুমের ইনজেকশন করেছিল। অন্যান্য ওষুধপত্র ও ইনজেকশনও তাকে দেওয়া হয়। তার মধ্যেই সদর থেকে এস ডি ও এবং সি এম ও এইচ এসেছিল। নিজ নিজ ডিরেক্টরেটের কাছে রিপোর্ট করার জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকু তদন্ত করে তারা চলে গেছে। যাওয়ার আগে এস ডি ও স্থানীয় থানায় অবশ্য কিছু নির্দেশ দিয়ে যায়।

অশোক ইরাবতীকে নিয়ে যখন জীপে ওঠে, তখন সন্ধ্যা। ব্যবস্থাটা হয়েছে সি এম ও এইচ-এর অনুরোধে। সামনের সিটে বিনয়ের পাশে ইরাবতীকে বসানো হয়। একজন নার্স এ-পাশ থেকে তাকে ধরে রাখে। অশোক বসে পিছনের সিটে।

ইরাবতী সম্পূর্ণ নির্বাক। তার চোখে এখনো সমান বিহ্বলতা এবং ভীতি। তাকে গাড়িতে বসানোর পরে অশোক এসে গাড়িতে ওঠে পিছনের দিক দিয়ে। ইরাবতীর মুখ থেকে নির্গত প্যারালডিহাইডের মাদক গন্ধ এখনো প্রবল। প্যারালডিহাইড ইনজেকশন করেই তাকে ঘুম পাড়ানো হয়েছিল। তার মুখের চার-পাঁচ জায়গায় নখের আঁচড়ের ক্ষতের উপর মাকিউরিক্রোমের লাল লাল দাগ। এ-সব মিলিয়ে তাকে দেখাচ্ছে করুণ এবং একই সময়ে ভয়ংকর। নার্স তার মাথা এবং মুখের কিছু অংশ একখানা কালো শাল দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। গাড়ির ঝাঁকানি কিংবা সামান্য নড়াচড়াতেই শাল মাথা থেকে গড়িয়ে ঘাড়ের উপর পড়ছে এবং ইরাবতী নিজে কোনো প্রয়াসই করছে না নিজেকে ঢাকার। সম্ভবত এ-বোধও এখন তার নেই। নার্স বারবারই শাল তুলে তার মুখ ঢেকে দিচ্ছে। যতবার মাথা থেকে আচ্ছাদন পড়ে যাচ্ছে, পিছনের সিটে একপাশে বসে থাকা অশোকের নজরে পড়ছে তার ভয়ংকর করুণ প্রোফাইল। আর ততবারই আত্ম-ধিক্কার ও অসহ্য যন্ত্রণায় ভিতরটা তার মুচড়ে উঠছে। যদি কোনো উপায় থাকতো ইরাবতীর যাবতীয় লাঞ্ছনা মুছে দেবার!

সদরের হাসপাতালে ইরাবতীর বান্ধবী মনীষা এবং তার স্বামী দু'জনেই ডাক্তার। জীপটা থামতে একে একে ডাক্তার ও নার্সদের বেশ বড়ো একটা সরব ভিড় তৈরি হয়। যে-ধরনের প্রতিবাদ, বিক্ষোভ মন্তব্য এইসব সময়ে স্বাভাবিক—সেইভাবেই ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল, কিন্তু নার্স যখন ইরাবতীকে গাড়ি থেকে ধরে নামায়, তার নির্বাক, ভয়ংকর এবং একই সময়ে নির্বোধ দৃষ্টিতে মুহূর্তে এতগুলো মানুষ চুপ করে যায়। এরা কেউই পরিষ্কার করে জানে না যে পানজোড়া হাসপাতালে ঠিক কী হয়েছিল। এরা জানে তাদের এক মহিলা সহকর্মী লাঞ্ছিত হয়েছে। কিন্তু এখন ইরাবতীকে দেখে তারা সম্ভবত ব্যাপারটার খানিকটা আঁচ করতে পারে।

মনীষা ইরাবতীর হাত ধরে ভিতরে চলে যায়। ইরাবতী ভর-

হওয়া মানুষের মতো হাঁটে। অশোক মনীষার স্বামীকে একপাশে ডেকে নিয়ে বলে, আপনার সঙ্গে আমার আলাপ নেই। আমি পানজোড়ার বি ডি ও অশোক রায়।

মনীষার স্বামী বলে, আমার নাম সমর ব্যানার্জি।

অশোক বলে, ইরাবতী আমারও বন্ধু। কাজেই ঘটনাটায় আমি ভীষণভাবে আঘাত পেয়েছি। যে-শক্‌টা উনি পেয়েছেন, তা মারাত্মক। আপনারা ডাক্তার, আপনারা আরো ভালো বুঝবেন। যদি আপত্তি না করেন, আমি কাল টেলিফোনে একবার খবর নেব আপনার কাছ থেকে। তিন-চারদিন পরে একবার সময় পেলে আসতেও পারি।

সমর বলে, আরে না না। আপত্তি থাকবে কেন ? আসুন-না, চা খেয়ে যান। আপনার কাছ থেকে পুরো ব্যাপারটা শুনি।

অশোক বলে, ক্ষমা করবেন, আজ বসতে পারব না। রাত হয়ে গেছে। তাছাড়া আজই আমাকে পানজোড়ায় ফিরে যেতে হবে। বুঝতেই পারছেন, এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেছে।

পরদিন অফিসে এসে পরিমলের টেলিগ্রাম পায় অশোক। অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের যন্ত্রণায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে পরিমল। সম্ভবত অপারেশন করতে হবে। প্রার্থনা একমাসের ছুটি।

শেষবেলায় সদরের টেলিফোন আসে। ওধারে সুদীপ। ডি এম চায় অবিলম্বে কালভার্ট তৈরির ওয়ার্ক-অর্ডার যেন অশোক দিয়ে দেয়। আর কিছু না হোক, কালভার্টটা জরুরি, মানুষের অসুবিধা হচ্ছে।

অশোক বলে, অঘ্রান মাসে কালভার্ট জরুরি কী করে ? ধানকাটা শুরু হয়ে গেছে। এখন তো সবদিকেই শুকনো খটখটে রাস্তা !

সুদীপ বলে, তাহলে ওয়ার্ক-অর্ডারটাই জরুরি। আমার বুঝতে ভুল হতে পারে।

অশোক বলে, আমাকে বেইজ্জত করার ব্যাপারে দেখছি তোমরাও হাত মিলিয়েছ ?

সুদীপ বলে, চোরের চাকর বলে আমাদের পুব বাংলায় একটা কথা আছে। শুনেছিস কখনো ?

অশোক বলে, না।

সুদীপ বলে, যে চোর তার তো অপবাদ, লাঞ্ছনা, ধিক্‌কার এ-সবই প্রাপ্য। আর তার যে চাকর, তাকে যে কী পরিমাণ গোবেচারা হতে হবে, তার আর মাপকাঠি নেই। সেরকম একখানা মুখের ছবি ভাবো।

— ভাবলাম।

— আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখিস তো নিজের মতো কিংবা আমার মতো লাগে কিনা ?

— আমার মতো লাগে না এখনি সেটা হলফ করে বলতে পারি।

— ইরাবতী-লাঞ্ছনার পর ?

— মানে ?

— মানে গতকালের ঘটনার পর শুধু লাঞ্ছনার কথাই নয়, অশোক-ইরাবতী সংবাদও লোকের মুখে মুখে ঘুরছে ডালপালায় পল্লবিত হয়ে।

অশোক একটু সময় চুপ করে থাকে। তারপরে বলে, তাতে আমার মুখ চোরের চাকরের মতো হবে কেন ?

সুদীপ বলে, রাগ করলি নাকি ?

অশোক বলে, না।

সুদীপ বলে, আমার বউ বলে, তুই নাকি ডেপুটিদের মধ্যে সব থেকে সেয়ানা।

— সেয়ানা ?

— হ্যাঁ, কারণটা শোন। আমাদের বউদের মধ্যে কেউ কেউ চাকরি-বাকরি করে বটে, কিন্তু আস্ত একখানা এম বি বি এস কেউ নয়। তুই নাকি একেবারে বুলস্ আই বিদ্ধ করেছিস।

সুদীপকে স্থূল লাগে অশোকের।

সে বলে, বউদি খুব দূরদর্শী।

টেলিফোনের মধ্যে কয়েক সেকেণ্ড ঝড়ের শব্দ। শোনে দু'জনেই। ঝড় থেমে গেলে সুদীপ বলে, লাইনটা যাবে মনে হচ্ছে। তার আগে আসল কথাটা সেরে নিই। তাহলে ডি এম-কে কী বলব?

—বলবে, ফাইলটা আমি নোট দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওয়ার্ক-অর্ডারটা তোমরাই দিয়ো যদি সম্ভব হয়।

সুদীপ অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে, যতক্ষণ টেলিফোনে চুপ করে থাকা সম্ভব।

অশোক বলে, হ্যালো? হ্যালো?

সুদীপ বলে, উইশ ইউ গুড লাক।

আরো একটু সময়ের স্তব্ধতা।

তারপর সুদীপ আবার বলে, উইশ ইউ গুড লাক।

দিন তিনেক পরে অনাদি এসে হাজির হয় অফিসে। ভারি উজ্জ্বল মুখ। সেই তর্কাতর্কির পর তাকে আর দেখেনি অশোক। এমন-কি হাসপাতালের ঝামেলার পরেও নয়। অশোক শুনেছিল, অনাদি কলকাতা গেছে। সে আন্দাজ করেছিল, তাকে এখান থেকে বদলি করাবার উদ্দেশ্য নিয়ে অনাদি কলকাতা গেছে।

অনাদি বলে, ব্লকে নাকি ভীষণ গণ্ডগোল আর ঝামেলা চলছে? এ-সব শুনেই আমি কাজকর্ম ফেলে রেখে ছুটে এসেছি।

কথা বলতে বলতেই সে তার ব্যাগ হাতড়াচ্ছিল। শেষে একটা খাম বের করে বলে, নিন। রাইটার্স থেকে একটা অ্যাডভান্স কপি আমার হতে ধরিয়ে দিল।

অশোক বলে, কী এটা?

অনাদি বলে আপনার একটা ঝামেলা বাঁচল, পরিমলের বদলির অর্ডারের ক্যানসেলেশন। মিটিং দিয়েছিলেন নাকি শুনলাম? কোরাম

হয়নি তো ? সে ভালোই হয়েছে। আগামী বুধবারে মিটিং ডাকুন, আমি আছি।

উঠতে উঠতে আবার বসে পড়ে অনাদি। বলে, ভালো কথা, রাইটার্সে পরিমলের সঙ্গেও দেখা হ'ল। ও নাকি অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের কথা লিখে ছুটি চেয়েছিল ? কলকাতায় বড়ো ডাক্তার দেখিয়েছে। ও-সব কিছু নয়। ছু-চারদিনের মধ্যেই জয়েন করবে।

ইরাবতী সদরে আসার চারদিন পরে মাসের চতুর্থ শনিবার। সরকারি অফিস ছুটি। অশোক ইরাবতীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য পানজোড়া থেকে বাসে করে যখন শহরে আসে, তখন সকাল সাড়ে ন'টা বাজে। ডাক্তার ব্যানার্জির বাসায় আসতে আরো আধ ঘণ্টা।

ব্যানার্জি ডিউটিতে চলে গেছে। মনীষাও যাওয়ার জন্য তৈরি। সে-ই অভ্যর্থনা করে।

—আসুন মিস্টার রায়, আমরা আপনার কথাই ভাবছিলাম।

—ইরাবতী কেমন আছেন ?

—বেটার, কিন্তু শক্‌টা খুবই মারাত্মক। এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

—ইরাবতী কি পানজোড়ায় আবার জয়েন করবেন ?

—মাথা খারাপ! আমাদের অ্যাসোসিয়েশন ব্যাপারটা খুব সিরিয়াসলি নিয়েছে। আপাতত ও ছু'মাসের ছুটিতে যাবে। এ মাসের তো আর কটা দিন মাত্র আছে। মাইনেটা নিয়ে কলকাতা চলে যাবে।

—সেই ভালো হবে।

—আপনি বসুন, আমি ওকে ডাকি।

ইরাবতী নিজেই আসে, মনীষা তার পিছনে। ইরাবতী একবারই অশোকের দিকে তাকায়, একটু হাসার চেষ্টা করে বিফল হয়। তারপর একটা সোফায় বসে পড়ে গা এলিয়ে দেয়। দৃষ্টি নিকটবর্তী

একটা জানালার বাইরে মেলে দিয়ে সে পাণ্ডুর হয়ে থাকে।

মনীষা বলে, আমাকে একটু মাফ করতে হবে অশোকবাবু। মাসের ফোর্থ স্যাটারডে-তে আমার আর নিস্তার নেই। বাচ্চাদের পোলিও খাওয়াবার ডেট। অর্থাৎ ঘণ্টা তিনেকে এখন আমার তিন-দিনের আয়ু কমাবে। কিন্তু কান্ট্ হেল্প। বরং আমার একটা প্রস্তাব আছে, আজ এখানেই খাওয়াদাওয়া করুন-না? অবশ্য আমি একটার আগে ফিরতে পারছি না। তবে ইরাবতী তো আছে। আপনারাও গল্প করার অনেক সময় পাবেন।

মনীষার কথাগুলোর মধ্যে অশোক মহিলাদের সেই কিছু একটা ঘটিয়ে দেবার অভিসন্ধির গন্ধ পায় যেন। ব্যাপারটা তার খারাপ লাগে। সে বলে, ক্ষমা করবেন, আমার তো এক বন্ধুর বাসায় খাবার কথা আছে। ওরা অপেক্ষা করে থাকবে। আমি অবশ্য আছি খানিকক্ষণ।

কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। সুদীপের বাসায় খাবার কথা সে নিজেই বলে এসেছিল। মনীষা বলে, তাহলে তো আর কিছু বলার নেই। আমি তাহলে চলি। ইরাবতী, অশোকবাবুকে চা দিস, ফ্লাস্কে চা করাই আছে। অশোকবাবু, কাইণ্ড্লি দরজাটা খিল দিয়ে দিন।

মনীষা চলে যেতে অশোক ইরাবতীর দিকে পুরোপুরি তাকায়। ইরাবতীর চোখেমুখে সেই বিহ্বলতা নেই বটে, কিন্তু আছে এক প্রগাঢ় অশান্তির বিষণ্ণতা। অশোক তার মুখ থেকে চোখ সরিয়ে বাইরে বেরোবার দরজার ছিটকিনির দিকে তাকায়। দরজা বন্ধ করার ভেতরে অনেক কথা এবং বিচিত্র সব অনুভূতি থাকে। তার দ্বিধা হয়, আবার লোভও হয়। ভয় হয় এই কারণে যে, আবেগের মারাত্মক কারণসমূহ তাদের দু'জনের মধ্যেই এই মুহূর্তে বড়ো প্রবল। সব থেকে বড়ো কারণ আঘাত। কাজেই ভুল বোঝাবুঝির কোনো কারণ না ঘটে যায়।

সে উঠে দরজার ছিটকিনি বন্ধ করে দেয়। ফিরে এসে নিজের

জায়গায় বসতে গিয়ে তার চোখে পড়ে, ইরাবতীর হেলিয়ে রাখা মাথা আরো সামনে ঝুঁকেছে এবং গাল বেয়ে জলের রেখা নেমেছে। ইরাবতী নিঃশব্দে কাঁদছে।

অশোক অসম্ভব অভিভূত হয়ে পড়ে। ইরাবতীর অসাধারণ মর্যাদাময় চেহারায় কান্না—শোক এবং আঘাতকে যেন মূর্তিমতী করেছে। সে বুঝতে পারে না, এ-সময় কী করা বা বলা উচিত। অশোক নিজেও মুখ নিচু করে থাকে। দ্বিতীয়বার চোখ তুলে তাকাতে অশোক ইরাবতীর নাকের পাটার স্ফুরণ ও কম্পন দেখে, দেখে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে রাখার অক্ষম চেষ্টা। সে নিজেকে আর সংযত রাখতে পারে না। উঠে এসে ইরাবতীর সোফার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে। সোফার একটা হাতল দু'হাতে ধরে সে কোনোমতে বলে—ইরাবতী, আমাকে ক্ষমা করুন।

ইরাবতী অশোকের হাতের উপরে মাথা রাখে। অশোকের হাত শক্ত করে ধ'রে এবার সে শব্দ করে কেঁদে ওঠে। কান্নার বেগে তার সমস্ত শরীর কাঁপে। অশোক সেভাবেই বসে থাকে। তার ভিতরের যাবতীয় সৎ ও মূল্যবান অনুভূতি যেন গলে গলে তার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। এমন সুখানুভূতি সে সারা জীবনে আর কখনো পায়নি। তার চোখ ভিজে উঠেছে। নিজেকে মনে হচ্ছে ভারি হৃদয়বান, মহান এবং দায়িত্বশীল। সেইসঙ্গে সে ছিল ভারি কৃতজ্ঞ, কেননা এ-সবই ইরাবতীর জন্য।

অশোক একখানা হাত ইরাবতীর মাথার উপরে রাখে। ইরাবতীর কান্নার বেগ আস্তে আস্তে কমে। তারপর এক সময় সে একেবারেই চুপ করে যায়, শুধু কিছু সময় পর পর কাঁপা কাঁপা দীর্ঘশ্বাস তার বুক থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে। আরো কিছু সময় পরে সে উঠে ধীরে ধীরে ভিতরে চলে যায়।

মিনিট দশেক পরে চোখমুখ ধুয়ে ইরাবতী এককাপ চা নিয়ে ভিতরে আসে। এখন তাকে অনেক তাজা এবং সলজ্জ দেখাচ্ছে।

অশোকের হাতে চা দিয়ে সে তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে। হাসে অশোকও।

সুদীপের বাসায় যখন অশোক পৌঁছোয়, তখন প্রায় একটা বাজে। দরজা খুলে দেয় সুদীপের বউ শান্তা। সে খুব ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করে, ইরাবতী কেমন আছেন অশোকদা ?

এই ব্যগ্রতা অশোকের ভালো লাগে এখন।

সে হেসে বলে, ভালো।

শান্তা বলে—ছি ছি, কী কাণ্ড !

সুদীপ বলে, এর জন্য দায়ী ও নিজে। অশোক নিজেই এই নিরপরাধ মহিলার লাঞ্ছনার কারণ। ওর কিছু শাস্তি হওয়া দরকার।

অথচ ইরাবতী বলেছে, তা কেন ভাবছেন ? আমি সেরকম ভাবি নি।

অশোক বলেছে, কয়েকটা বদমাস লোক—

ইরাবতী বলেছে, তাও ঠিক নয়। মানুষের ক্ষোভ তো আর মিথ্যে নয়। কখনো কখনো আমি বা আপনি তার শিকার হয়ে যাই। ক্ষোভের কারণ আছে, ক্ষোভ আছে। সেই ক্ষোভ প্রকাশের পদ্ধতিটা কী, সেটা তারা হয়তো জানে না। আপনি যাদের কয়েকটা বদমাস বলছেন, তারা শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থেই সেই ক্ষোভটাকে ব্যবহার করছে। চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যের সুবন্দোবস্তের জন্য আন্দোলন করা চলবে না। এতকাল মানুষ যে-সব বিষয় নিয়ে আন্দোলন করেছে, আজ আর সে-সবের কোনোকিছু নিয়েই আন্দোলন করা চলবে না। তবে মানুষকে সঙ্গে রাখবে কীভাবে ? ক্ষোভের বাষ্প বেশি জমলে সব-কিছু ফেটে চৌচির হয়ে যেতে পারে। সুতরাং ডাক্তার কিম্বা বি ডি ও-কে পিটিয়ে, হাসপাতাল অফিস ভাঙচুর করে সেই বাষ্পের কিছুটা বের করে দাও। মানুষ তোমার সঙ্গে থাকবে। আপনি বলবেন, এতসব বিচার বিবেচনা করে কি ওরা এ-সব করেছে ? না, তা করেনি। কিন্তু বহু জায়গায় পরিকল্পনা করেই এ-সব হচ্ছে

বলে আমার বিশ্বাস। আর বহু জায়গায় হতে থাকলেই পদ্ধতিটা সাধারণ হয়ে দাঁড়ায়। তখন সর্বত্র একই রকম হবে।

ইরাবতীকে যেন কথায় পেয়ে বসেছিল। ইরাবতী অনর্গল কথা বলেছে। অশোক শুধু শুনেছে। ইরাবতী বলেছে, কিন্তু আমার সব থেকে বড়ো আঘাতটা কোথায় লেগেছে জানেন ? আমি ওখানে যাওয়ার পর মানুষের কাছ থেকে শুধু শ্রদ্ধা আর ভালোবাসাই পেয়েছি। জ্ঞানত কোনো অন্যায় করিনি। চাকরি করছি বলে নিয়মমাফিক কাজ করিনি। আমি ওদের শত্রু না বন্ধু, একথা ওদের বুঝিয়ে দেবে কে ? আমি একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছি। নিঃসঙ্গতা আর ভয় আমাকে পেয়ে বসেছে। ভয় হয়, ক্রমশ হয়তো আমি নিয়মমাফিক চাকরি করতে শুরু করব, যে-কোনো উপায়ে পয়সা রোজগারের পদ্ধতি বের করব।

টুকরো টুকরো কথা বলছিল ইরাবতী। সেই টুকরোগুলো জোড়া দিলে এরকম একটা বক্তব্য দাঁড়ায়। অশোক মুগ্ধ হয়ে শুনেছে। ইরাবতীর উপর শ্রদ্ধা বেড়েছে তার।

অথচ সুদীপের মতো বুদ্ধিমান মানুষ বলছে, সে-ই দায়ী। হয়তো সুদীপ পরিহাস করেই বলছে, তবুও শুনতে তার ভালো লাগছে না। সে প্রসঙ্গান্তরে যায়। বলে, পরিমলের বদলি ক্যানসেল হল কী করে সুদীপদা ?

সুদীপ হাতখানা যথাসম্ভব উপরের দিকে তুলে তর্জনী দিয়ে আরো উপরের ইঙ্গিত করে।

অশোক বলে, ডি এম ব্যাপারটা মেনে নিলেন ?

সুদীপ বলে—অশোক, আবার তুই বোকার মতো কথা বলতে শুরু করেছিস। অফিসের কথা থাক্। বিয়ে করছিস কবে বল ?

বুধবারে একটা প্রবল ঝামেলা আছে, এরকম একটা মানসিক প্রস্তুতি অশোকের ছিল। সে ঠিক করে রেখেছিল, কিছুতেই মেজাজ

খারাপ করবে না। সে ভেবেছিল অনাদির গোষ্ঠী তাকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করবে, চেঁচামেচি করবে। তার প্রস্তুতি ছিল মাত্র এরকম সম্ভাবনার জন্যই।

কিন্তু বুধবারে অফিসের বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই তার ভুল ভাঙে। ভুলটা ভাঙতে সময় লেগেছে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। এই সময়ে তার হৃৎপিণ্ড এক ঝলক তাজা রক্ত হঠাৎ ঠেলে দিয়েছে ধমনীতে। ভুলের জন্যই হৃদয়ের এই উচ্ছ্বাস।

বারান্দায় উঠে আসতেই সে রাস্তার দিক থেকে আসা একটা ট্রাক থামার শব্দ শোনে। সে ঘুরে তাকায়। অফিস থেকে সামান্য দূরে ট্রাকটা থেমেছে। ট্রাক ভর্তি লাল ঝাণ্ডা হাতে মানুষ। স্লোগান তারাই দিচ্ছে।

কয়েক মুহূর্ত শুধু। আটষট্টি, উনসত্তর, সত্তরে কলকাতার রাস্তায় অসংখ্য মানুষের মিছিলে, স্লোগানে, ফেস্টুনে বুকের রক্ত উষ্ণ হয়ে ছলকে উঠত। নিজেকে মনে হত শরিক। সেই স্মৃতি ভুলটা করায়। বুকের রক্ত লাফ দিয়ে ওঠে ঠিকই, তারপরেই বড়ো শোচনীয় ভাবে ভুল ভাঙে। স্লোগান তারই বিরুদ্ধে। এইসব আন্দোলনকারীদের উদ্যত মুষ্টি তারই দিকে। সে ঘরে ঢুকে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে।

জল খাওয়ার পরে সিগারেট টানতে টানতে সে আরো দু'খানা ট্রাক আসার শব্দ শোনে। স্লোগানের শব্দ আরো উঁচুতে ওঠে। ভবেশের পোস্টার, কর্মচারীদের ডেপুটেশনে যে-সব অভিযোগ ছিল, এদের স্লোগানে সেগুলো ছাড়াও আরো কিছু আছে।

মিনিট পনরো পরে পাঁচ-সাতজনের একদল অপরিচিত মানুষ তার ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তিকে নেতৃস্থানীয় মনে হয়, সে বলে—আমার নাম গগন মণ্ডল। আমি পানজোড়া থানার কৃষক সংগঠনের সেক্রেটারি।

অশোক বলে, বলুন।

—আমরা একটা ডেপুটেশন নিয়ে এসেছি। আমাদের কথা

আপনাকে শুনতে হবে।

—ডেপুটেশন দিতে হলে তো আগে জানাতে হয়। আপনারা তো আগে জানাননি কিছু!

—শনিবার এসেছিলাম, আপনি ছিলেন না।

—শনিবার তো ছুটি ছিল। তাছাড়া তার পরও তো কয়েকটা দিন পেয়েছেন?

—কেন? আজ তো আপনি আছেন, তাহলে আর অসুবিধা কী?

—অসুবিধা আছে। ঘণ্টাখানেক পরে পঞ্চায়েতের খুব জরুরি মিটিং। সময় দেব কী করে আপনাদের?

—তাহলে তো ভালোই হ'ল। মিটিং শুরু হওয়ার আগে আমাদের ঘণ্টাখানেক সময় দেবেন। আমি অনাদিদার সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি।

গগন বেশি কথার মানুষ নয়। সে দলবল নিয়ে বেরিয়ে যায়।

তারপর আরো খানদুয়েক ট্রাক আসে। প্রায় চার-পাঁচশো মানুষ অফিস-সংলগ্ন মাঠে জমায়েত হয়। রিকসায় করে একটা মাইক্রোফোন আসে। বিপুল উদ্যমে মাইক নিয়ে স্লোগান শুরু হয়। বেশ খানিকক্ষণ স্লোগান চলার পর বক্তৃতা। অর্ধ-শিক্ষিত, অশিক্ষিত বক্তারা আন্তর্জাতিক, জাতীয়, রাজ্য এবং ব্লকস্তরের সমস্যা নিয়ে নিজ নিজ বোধবুদ্ধিমত বক্তৃতা দেয়; আর এই-সমস্ত সংকটের জন্য বি ডি ও-কে দায়ী করার একটা অদম্য প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাতে থাকে। এ রকম ভীষণ অবিশ্বাস্য সব বক্তব্য শুনতে শুনতে অশোকের ইরাবতীর কথা মনে হয়। ইরাবতী যেভাবে ব্যাখ্যা করেছে, সে সেভাবে ভাবতে থাকে। বাইরে নতুন একজন বক্তা বিকট চিৎকারে কিছু বলতে থাকে। অসংলগ্ন বক্তব্যে বি ডি ও-র নামে কাঁচা গালাগাল, ইরাবতীকে জড়িয়ে কুৎসাও বাদ যায় না।

তখন বিনয় আসে। বলে, একটা কথা বলতে এসেছিলাম, স্যার।

অশোক বলে, বলুন বিনয়দা।

—থানায় একটা খবর দিয়ে রাখলে হ'ত—

—কেন ?

—এদের ভাবগতি আমার ভালো মনে হচ্ছে না স্যার।

—না, থানায় কিছু জানাতে হবে না।

—স্যার ?

—আপনি ভয় পাচ্ছেন নাকি বিনয়দা ?

—কানাঘুষোয় এদের পরিকল্পনা কিছু শুনেছি। ওরা স্যার, আজ আপনাকে অপমান করতে পারে, বেশি কিছুও করতে পারে।

—তাতেই কি আমি ভয় পেয়ে পুলিশ ডাকব বিনয়দা ? অত ভয় পাবেন না। আর থানায় খবর দেবেন না যেন। আপনি নকুলকে বলুন আমাকে এক কাপ চা এনে দিতে।

বিনয় বেরিয়ে যেতে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অশোক দেখল এগারোটা বাজে। মিটিং-এর এখনো আধঘণ্টা বাকি। ইরাবতী মুখ নামিয়ে নিয়ে বলেছিল, আপনার জন্য আমার বড়ো চিন্তা হয়।

বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ সুদীপ এ ডি এম-এর ঘরে খুব দ্রুত পায়ে ঢোকে।

—স্যার, পানজোড়া থেকে একটা অ্যালারমিং খবর এসেছে !

—কী খবর ?

—অশোক ঘেরাও হয়ে আছে, একটা অ্যাসল্টের সম্ভাবনাও আছে।

—কে ফোন করেছিল ?

—ফোন করেছে ব্লকের ড্রাইভার বিনয়বাবু। অশোক থানায় খবর দেয়নি। ড্রাইভার বলল, থানায় খবর দেওয়ার কথা সে বলেছিল, কিন্তু অশোক রাজি হয়নি। একটা মারাত্মক কিছুর প্ল্যান আছে বলে ওরা মনে করছে। আমাকে বলল পুলিশ নিয়ে যেতে।

—অশোক ইজ আ ফুল !

—কিন্তু এখন করব কী স্যার ?

এ ডি এম টেলিফোনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ডি এস পি দত্তকে ডাকো।

এ ডি এম পঞ্চাশোর্ধ্ব প্রমোশন পাওয়া আই এ এস। যখন প্রশাসনই ছিল সরকারের প্রথম বিবেচনা, এ ডি এম সেই যুগের অফিসার। উন্নয়ন বোঝে না, একথা সে সগর্বে বলে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় এ জেলাতেই দু জায়গায় গুলি চালাবার হুকুম দেওয়ার কৃতিত্ব তার আছে।

ডি এস পি, হেড কোয়ার্টার দত্ত আসে। ডি এম সদরে নেই, কাজেই দায়িত্ব সব এ ডি এমের। এস ডি ও-কে ডেকে এস পি-কে খবর জানিয়ে কিছু পরিকল্পনা করা হয় দ্রুত। তারপর চারখানা জীপ পুলিশ নিয়ে পানজোড়া ব্লকের দিকে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায়।

সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে এসে সুপিন বর্মন দাওয়ার উপরে পাতা একটা খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপরে বসে। গায়ের চাদরটা একপাশে সরিয়ে রেখে 'গেরস্থানি' বলে একটা হাঁক দেয়। মোহিনী কাছে এলে সে বলে, কুনঠি থাকিস, ডাইকে পাই না? একঘটি জল দি। মোহিনী বোঝে এ হল উপক্রমণিকা। একঘটি জল নিয়ে এসে হাতে দিয়ে বলে, ফের কী হইল হায়?

সুপিন ঢকঢক করে জল খায়।

মোহিনী বলে, চাদর খুইলে ফেলালেন, হিম পড়া ধরিছে না?

সুপিন ঘটিটা নামিয়ে রেখে বলে, হাঃ!

তারপর বেশ-কিছু সময় সে চুপ করে থাকে। তারপর বলে, মেম্বরি ছাড়ে দিলাম।

—ক্যান্!

মোহিনী খুব আশ্চর্য হয়। পঞ্চায়েতের সদস্যপদ সুপিনের কোনো ব্যবহারিক কাজে লাগুক আর নাই লাগুক, এতে তার একটা সামাজিক সম্মান হয়েছিল। যে জীবনে মর্যাদা কখনোই পাওয়া

যায় না, সেখানে মর্যাদার দাম অনেক বেশি। সুপিন সদস্য হয়ে মর্যাদাবান হয়েছিল। আজ তার মোহভঙ্গ হয়েছে।

সে বলে, বি ডি ও সাহেব আজ মোর পাটির মানষের হাতেৎ মার খাইছে।

—হায় মাও, ক্যান্?

কেন বি ডি ও মার খেয়েছে সে কথা মোহিনীকে বোঝানো খুব সহজ নয়। সুপিন নিজেও কি সব বুঝেছে? তবে এটুকু বুঝেছে যে, এ ভারি অন্যায় হয়েছে। তাই ফেরার আগে একজন নেতাকে সে বলে এসেছে, চেয়ারম্যান সাহেবকে বলে দিতে যে সুপিন বর্মন আর এ-সবের মধ্যে নেই। তার ভালোই শিক্ষা হল আজ।

অফিসে গিয়ে সুপিন খুব অবাক হয়েছিল। এত মানুষ কেন? পরে শুনেছে, ডেপুটেশন। মিটিং-হলে গিয়ে দেখেছে শুধুমাত্র তার দলের সদস্যরাই এসেছে, বিরোধী সদস্যদের একজনও আসেনি। পরে বুঝেছে, তারা কিছু আশঙ্কা করেছিল এবং ভয় পেয়েছিল।

কেমন একটা থমথমে ভাব, কানাঘুষো কথা, ফিসফিস, আকার ইঙ্গিত। তখন বি ডি ও ফাইল ও খাতাপত্র নিয়ে এসে ভিতরে ঢোকে, আর তার প্রায় পিছন পিছন দশ-বারোজনের একটা দল নিয়ে গগন মণ্ডল। ঘরে ঢুকে গগন এবং তার সঙ্গীরা প্রথমে নানা-রকম দাবিদাওয়া নিয়ে কথা বলতে শুরু করে। রাস্তাঘাট, রিলিফ, এন আর ই পি, ব্যাঙ্কের ঋণ—এ-সব নিয়ে তুমুল বাদবিতণ্ডা চলে। বি ডি ও কী উত্তর দেবে? পরিকল্পিত বিশৃঙ্খলা। একজনে এক কথা বলে, সে কথা উত্তর দেওয়ার আগেই আরেকজনে আরেক কথা তুলে চিৎকার করে। বি ডি ও তবুও ধৈর্য ধরে কথা বলতে থাকে। শেষপর্যন্ত গমচাষের মিনিকিট নিয়ে গগন গলা চড়ায়। অঘ্রান মাস পার হয়ে গেল, এরপরে মানুষ সার বীজ নিয়ে ইয়েতে গুঁজবে? প্রথম অশ্লীল কথাটা গগনের এক সঙ্গী বলে। বি ডি ও এ কথার পর খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। কিন্তু চুপ করে থাকলেও অন্যদের

কিছু যায় আসে না। তারা কথা শুনতে আসেনি, বলতে এসেছে। বি ডি ও বলে, চাষি কেন মিনিকিট এখনো পায়নি, সে কথা সভাপতিকে জিজ্ঞেস করুন।

সঙ্গে সঙ্গে আগুনে ঘি পড়ে। অনাদি এবং তার সঙ্গীরা ভীষণ গোলযোগ শুরু করে। আর ভিতরের গোলমাল বাইরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাইরের পাঁচশো মানুষ স্লোগান দিতে শুরু করে।

ভিতরে তখন কারো কথা কেউ শুনছে না। শুধু চিৎকার, চেঁচামেচি এবং গালাগাল। ভিড়ের ভিতরে গালাগাল দেওয়া খুব মজার। যে-কোনো কথাই নির্দ্বিধায় বলা যায়। সঙ্গে চেয়ার টেবিল ঠেলাঠেলির শব্দ।

—আমি এক বোকৃদা রাজবংশীর বেটা, এগ্‌লা রাজনীতি এনা কম বুঝি। আর হোবেই বা না ক্যান্? মোর বাপ ছিল না আরেক বোকৃদা? গুলি খায়ে সি মরল না? আর দেখ, কত মান্‌ষে সি তেভাগা লড়াইয়ে কত বড়ো বড়ো নেতা হয়া গেল, কত জমিজমার মালিক হয়া গেল!

তখন আমি কাছে যায়ে ক'লাম, এলা হছেডা কী? গগন মোক চোট দেখাল। ক'লো, তোমাক্ ফির এটি নাক গলাবা কে ক'লো? যাও, যেটি বসিছিলা সেটি গিয়া বসো! আমি ক'লাম, এই গগন মণ্ডল, আমি এঠি মেম্বর, তুমি লও! আমাক চোখ রাঙাবা না! তাৎ সি ক'লো, যখন তোমার মিটিং হোবে, তখন তুমি মেম্বর, এখন লও। যাও!

তাবাদে দেখি কতগুলা কাগজপত্তর খাতা, তাৎ নাকি বি ডি ওক্ সই দিবার হোবে! বি ডি ও সই দিবে না। ক'লো, মিটিং ছাড়া সই দিমো না। প্রধানদের সই করা লিস্টি চাই, তাবাদে সব ঠিক হোবে। আর সাথ সাথ শুরু হয়া গেল হাড্ডাহাড্ডি, ধাক্কাধাক্কি, চেয়ার টেবিল ওলোটপালোট।

ভিতরে স্লোগান, বাইরে স্লোগান। অশোক তার চেয়ার ছেড়ে উঠে

দাঁড়ায়। সংগঠিত বিশৃঙ্খলা এবং ভীষণ কিছু একটা করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ কিছু মানুষ। কেউ একজন একটা চেয়ার ছুঁড়ে মারে। অশোক বোঝে এরা শুধু তাকে বেইজ্জত নয়, জখমও করতে চায় ভালোমতো।

চেয়ারটা ছিটকে এসে পড়ল অশোকের সামনের টেবিলের উপর। সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের ভেতরের লোকগুলো তাকে ঘিরে ধরল।

—আপনি সই করবেন কি না ?

—না !

গগন মণ্ডল তখন তার কলার চেপে ধরে। বলে, তোর বাপ সই করবে।

অন্যেরা কেউ তাকে পিছন থেকে ধাক্কা মারছিল, কেউবা চায়ের ভাঁড়, সিগারেটের প্যাকেট তার গায়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিল।

অশোক গগনের হাত ঠেলে সরিয়ে দেয় এবং দু'হাত দিয়ে শক্তি প্রয়োগ ক'রে ঘরের বাইরে আসার চেষ্টা করে। অনাদি একপাশে একটা চেয়ারে তখন চুপচাপ বসেছিল।

অশোক যখন বাইরে আসে, গগন এবং তার সঙ্গীরা মার মার করতে করতে এবং তাকে ধাক্কা দিতে দিতে বাইরে আসে। এই সময় অফিসের কয়েকজন স্টাফ গগনকে বাধা দিতে এগিয়ে আসে। বিনয় একটা লোহার রড নিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে অশোক জাপটে ধরে তাকে আটকায়। বিনয়ের হাত থেকে রডটা নিয়ে সে আদিবাসী বিভাগের ইন্সপেক্টর সুবীরের হাতে দেয় এবং বলে, সরিয়ে ফেলুন এটা।

তুমুল গণ্ডগোল, বিশৃঙ্খলা এবং আকাশ-ফাটানো স্লোগান তখনো চলছে। অশোক সিঁড়ির উপরের ধাপে এসে দাঁড়ায়। প্রতিবন্ধকতা পেয়ে গগন এবং তার সঙ্গীরা নীচে নেমে ভিড়ের ভেতরে মিশে যায়। হয়তো তাদের যতটুকু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, ততটুকু তারা পালন করেছে, এমনও হতে পারে।

সিঁড়ির একধাপ নীচে স্লোগানের সূত্রধার মাইকের মাউথপিসটা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। অশোক একধাপ নেমে তার হাত থেকে মাউথপিসটা কেড়ে নেয়। হঠাৎ নীচের ভিড় করা মানুষেরা স্লোগান দেওয়া বন্ধ করে।

অশোক খুব ধীরে ধীরে বলে, আপনারা আমার কাছে ডেপুটেশন নিয়ে এসেছেন, না খুন করতে এসেছেন ?

অতগুলো মানুষ একেবারে স্তব্ধ হয়ে থাকে। অশোক বেশ-কিছু সময় চুপ করে থেকে কথাটা আবার বলে।

জনতা চুপ।

অশোক বলে, আপনাদের নেতা গগন মণ্ডল এবং চেয়ারম্যান অনাদিবাবু আমাকে দিয়ে বেআইনি ভাবে কিছু কাগজ সই করে নিতে চায়—জোর করে, আমাকে মারধোর করে। কী সেই কাগজগুলো আপনারা শুনবেন ?

গগন যায়নি। সে ভিড়ের মধ্যেই ছিল। লাফ দিয়ে উঠে সে গলা তোলে, ইনকিলাব—

প্রথমবারে কোনো সাড়া নেই।

দ্বিতীয়বারে পাঁচ-সাতজন বলে, জিন্দাবাদ।

তৃতীয়বারেও তাই।

কার ইঙ্গিতে যেন মাইকের লোকটি রিক্সার উপরে রাখা যন্ত্রটার সুইচ অফ্ করে দেয়।

সুপিন বর্মন লাফিয়ে নেমে তার ঘাড় ধরে বলে, মাইক চালা !

মাইক আবার চালু হয়।

অশোক বলে, আমাকে কি আপনারা কথাও বলতে দেবেন না ?

পাঁচ-সাতজন মানুষ গগনকে ধাক্কা দিয়ে বলে, থামো হে, বি ডি ও সাহেব কী বলে, হাঁরা নিজ কানে শুনবা চাই।

এবার আর গগনের ইনকিলাবে দু'জনের বেশি সাড়া পাওয়া যায় না।

অশোক তারপর একে একে পঞ্চায়েতের সঙ্গে তার বিরোধের কারণগুলো খুলে বলে।

একজন লোক বলে, এগলা গপ্পো হাঁরা শুনে কী করমো ? সার বীজ পামো কিনা সিটা ক'ন। সভাপতি ভট্ভটি চড়ে, আপনে গাড়িৎ চড়েন, হাঁরা পায়ে হাঁটি। এলা বিবাদ আপনাহোরের। হাঁরা সার বীজ কবে পামো সিটা ক'ন।

সুপিন বলে, ই লোকটা তোর সি খুড়ার বেটা ভাই, দিগম্বর বম্মন। শালা চোরের বেটা চোর ! মোহিনী ফোঁস্ করে উঠে বলে—অ্যাই, মোর বাপের বাড়ির নোককে তুমি চোর ক'ছেন !

সুপিন বলে, ক'মোনা ? শালা চোরের গুষ্টি চোর। পতিবার মিনিকিট নিবে। রাস্তাৎ আইসেই পরথমে সারের দোকানে সেলা বেচবে, তাবাদে গিয়া ঢুকবে মদন সার চুঁয়ানির দোকানেৎ। যেমন বজ্জাত, তেমন নিশাখোর। ফের সিদিন কী করিছে, শোন্। বড়ো রাস্তাৎ মাটি কাটার কাম হচ্ছে পঞ্চাইতের। আমিও সেটি ছিনো। এক চৌকা, দু চৌকা করে এক-একজনা মাটি কাটিছে। চৌকা দেখালে সাক্ষী কাইটে দিবা হয়।

মোহিনী বলে, সাক্ষী কী ?

সুপিন বলে, সাক্ষী হোল চৌকার ভিতরে যে উঁচা ঢিবা রাখবা হয় মাপ দেখার জন্য। তো দিগম্বর এক চৌকা দেখাল। সাক্ষী কাইটে তার নাম লেখা হোল কাগজেৎ। কিছু বাদে সি ফের আসি ক'লো, আমার আরেক চৌকা আছে, সিটা দেখো। হবেও বা। হারামজাদ করিছে কী জানো ? কাটা সাক্ষী ফের মাটি দিয়া খাড়া করিছে, এক কোদাল ঘাস মাপমত কাইটে তার মাথাৎ বসাছে, এনা দূর থিকা বোঝে কার বাপের সাধ্য ! শেষে ধরা পড়ে মার খায় আর কি !

মোহিনী বলে—হছে, হছে। আপিসেৎ কী হোল সিটা কও। সুপিন বলে, তো সি দিগম্বর বম্মনের কথায় বেশ-কিছু মানুষ হো হো

কইরে হাসবা ধরল। কেউবা ক'লো, ঠিক কথা, ল্যাজ্য কথা। মানুষগুলার মধ্যে তখন নানা কথা বলাবলি হবা ধরল। কেউ বলে, সব শালো চোর, সব শালো সমান। আর দিগম্বর ক'লো, ওলা কথায় চিড়া ভেজবে না, সার বীজ কবে পামো, সিটা ক'ন।

আর এই তো ফের গগন চেঁচাবা ধরল, এনকেলাপ—ফের হাল্লা। আর এরই মাঝে একখানা আধলা ইট ছুটে আসে বি ডি ও সাহেবের মাথাৎ নাগল। বি ডি ও সাহেব তো মাথাৎ হাত দিয়া বইসে পড়ল। ফের ইট, আর আমি স্বচক্ষে দেখনো, যি দু'তিনজনা মানুষ ইট মারিছে তাদের মধ্যে ভবেশ। আর কী অবাক কাণ্ড রে মোহিন পনরো-বিশজনা মানুষ ছুটে যায়ে মারতে মারতে ভবেশকে আধমরা করে ফেলালো।

অশোক মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়ার মধ্যেই আরো দু'খানা ইট এসে তার গায়ে পড়ে। সুপিন, একজন প্রধান, দু-তিনজন পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার, বিনয় এবং অফিসের কয়েকজন কর্মচারী অশোককে ঘিরে রাখে।

তখন চারখানা জীপ তীব্র হর্ন বাজিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে এসে চত্বরে দাঁড়ায়। এ ডি এম, ডি এস পি, সুদীপ এবং বিশ-পঁচিশজন পুলিশের লোক গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামে। কয়েকজন কনস্টেবল অফিসের দিকে পিছন দিয়ে রাইফেল তুলে পজিশন নেয়। বাকিরা লম্বা লাঠি হাতে আদেশের অপেক্ষায় থাকে।

সুদীপ এবং এ ডি এম দৌড়ে অশোকের কাছে আসে। বিনয় রুমাল ভিজিয়ে অশোকের ক্ষতস্থান চেপে ধরে আছে। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত গড়িয়ে নামছে বুকে।

প্রশাসনের রক্ত। এ ডি এম ক্ষিপ্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে মিস্টার দত্তকে বলে, চার্জ!

দত্ত গর্জন ক'রে সেই আদেশ পুনরাবৃত্তি করে।

অশোক বিনয়কে ধাক্কা দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়। চিৎকার করে বলে, না—!

সবাই একটু হকচকিয়ে যায়।

লাঠি হাতে এগিয়ে যাওয়া কনস্টেবলরা হতভম্ব এবং দ্বিধাগ্রস্ত।

অশোক সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসে। মাইকের মাউথপিস্‌টা তখনো পড়ে আছে। সেটা হাতে তুলে সে কষ্টের সঙ্গে বলে, আপনারা আজ যে যার বাড়ি চলে যান। আপনাদের দাবিগুলো মেটাবার জন্য আমি সবরকম চেষ্টা করব।

পুলিশ দেখে ভিড় অনেক দূরে সরে গিয়েছিল এবং পাতলা হতে শুরু করেছিল। অশোককে মাউথপিস্ নিয়ে দাঁড়াতে দেখে অনেক মানুষই আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। এখন তারা ধীরে ধীরে চলে যেতে থাকে।

এ ডি এম সুদীপের দিকে তাকিয়ে বলে, এ-সব নাটকের অর্থ কী?

ডি এস পি বলে, বিবেকের তাড়না! সে মুখভঙ্গি করে এবং সম্ভবত দি লাস্ট ডগ চৌবের কথা ভেবে আফসোস করে। সুদীপ মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয়।

অশোকের আঘাত কম নয়। তার মাথার ভিতরে অবশ ঝিমঝিম অনুভূতি বাড়ছিল। সে সুপিন বর্মনকে ধরে সিঁড়ির উপর বসে পড়ে। সুপিনের কাঁধের উপরে নিজের অজান্তেই অশোক মাথা রাখে। তারপর কিছু সময়ের জন্য সে জ্ঞান হারায়। মাথার ক্ষত থেকে প্রভূত রক্তপাত হচ্ছিল তার।

সদরের হাসপাতালে তিনদিন থাকতে হয় অশোককে। মাথার আঘাত, তার উপরে সে কিছু সময়ের জন্য জ্ঞান হারিয়েছিল। এইজন্যই তাকে হাসপাতালে থাকতে হয়। তাছাড়া তাকে স্যালাইনও দিতে হয়।

দ্বিতীয় দিনে সহকর্মীরা কেউ একা, কেউ সপরিবারে তার সঙ্গে দেখা করে যায়।

দেখাসাক্ষাতের নির্দিষ্ট সময়টুকু বাদ দিয়ে ইরাবতী দিনের অধিকাংশ সময় এবং সন্ধ্যার পরও বেশ-কিছু সময় অশোকের বেডের পাশে থাকে।

প্রথম দিন সন্ধ্যার পর অশোক একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। কখনো কখনো চেতনার উপরে একটা ঝাপসা পর্দার আড়াল, আবার কখনো পরিষ্কার জ্ঞান। তার মধ্যেই একসময় চোখ খুলে ইরাবতীকে সে পাশে দেখেছে। সে হাসার চেষ্টা করেছে। বিছানার উপর দিয়ে হাত ঘষতে ঘষতে ইরাবতীর কাছাকাছি নিয়ে গেছে স্পর্শের আকাঙ্ক্ষায়। ইরাবতী চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছে, এইভাবে চোখের জল আড়াল করতে চেয়েছে। ঘরের অন্ধকারে দৃষ্টি রেখেছে সে অনির্দিষ্ট করে। ঘরের আলো খুবই ম্লান। ইরাবতী ছেলেমানুষি সংকোচে অশোকের হাত ধরেছে। অশোক তার হাতে প্রবল চাপ দিয়েছে। হয়তো এভাবে সে জানাতে চেয়েছে যে, সে ঠিকই আছে।

তারপরে সে আবার আচ্ছন্ন হয়েছে এবং ইরাবতী ভেবেছে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। গায়ের উপর কম্বল টেনে দিয়ে, মশারি গুঁজে দিয়ে ইরাবতী একপাশের টেবিলে বসা নার্সের কাছে গিয়েছে। নার্সকে বলে একজন আয়ার ব্যবস্থা করেছে রাতে দেখাশুনা করার জন্য। তারপর সে চলে গেছে।

আচ্ছন্নতার ভিতরে অশোক তারপর অনেকবার ইরাবতীকে খুঁজেছে। আশঙ্কার মতো ইরাবতী বারবার কাছে এসে হারিয়ে গেছে, আবার এসেছে। তার আচ্ছন্ন চেতনায় ভিড় করে এসেছে মানুষের মুখ মিছিলের মতো। এসেছে এবং হারিয়ে গেছে। তারপর একসময় রবীন্দ্রনাথের মতো দাড়িসহ ধাবমান সাঁইদার তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বড়ো পরিষ্কার। ধামান বলেছে, বেঁকির ঘরেৎ যামেন ?

অশোক বলেছে—না, বেঁকির ঘরে যাব না।

ধামান সাঁইদার তখন অন্ধকারে ভাঙাচোরা সিঁড়ি ভেঙে নদীর দিকে চলে গেছে। অশোক আর তাকে দেখতে পায়নি, কিন্তু দূর থেকে ধামানের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছে। এপার থেকে ওপারের বাঁধে ধাক্কা খেয়ে ফিরছে ধামানের হাঁক। গহন অন্ধকারে প্রমত্ত ঝড়ের ভিতরে একাকী ধামান হাঁক দিয়ে ফেরে—তার হারানো ঊনপঞ্চাশ নৌকার সাঁইকে। অশোক কি নেমে যাবে ধামানের পিছনে পিছনে নদীর কাছে? অশোক কি যাবে অন্ধকারের মধ্যে ধামানের মতো দৃঢ় প্রত্যয় ফিরিয়ে আনতে?

দ্বিতীয় দিনে অশোক বলেছে, চোখে জল কেন? আমি তো জিতেছি।

ইরাবতী মুখ ফিরিয়েছে।

অশোক বলেছে, আপনি বলছিলেন না, আমরা ওদের শত্রু না বন্ধু, সে কথা ওদের কে বুঝিয়ে দেবে? আমি বুঝেছি, সেটাও আমাদেরই বুঝিয়ে দিতে হবে। তবে মুখের কথায় নয়, অন্যভাবে। ভারতীয় কৃষকদের এক সরল মহানুভবতা আছে, যার উপরে আমরা শিক্ষিত মানুষেরা কখনোই ভরসা করি না। কিন্তু আছে। যে লোকটা আমাকে ইট ছুড়েছে, ঐ মানুষেরাই তাকে ধরে শাস্তি দিয়েছে। আমাকে যখন কয়েকজন লোক মারধোর করার চেষ্টা করেছে, ওদের মধ্যেরই অন্য লোকেরা আমাকে ঘিরে ধরে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। আমি তো জিতেছি, পানজোড়ায় ফিরে যেতে আমার কোনো ভয় কিংবা সংকোচ নেই।

দিন দশেক পরে উপর থেকে সরকারি নির্দেশ আসে অশোকের বিরুদ্ধে। আপাতত তাকে দু'মাসের ছুটি নিতে বলা হয়েছে। সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং নির্বাচিত পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তের বে-আইনি বিরোধিতার জন্য সরকার তার উপর খুবই বিরক্ত। এ সম্পর্কে ব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে।

—